إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত কে ?
সে-ই, যে বিশ্বাস করে যে,
আল্লাহ্ সত্য এবং মোহাম্মদ (সাঃ)
তাঁহার এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে
যোজক স্থানীয় এবং আকাশের নিম্নে
তাঁহার সমমর্যাদা বিশিষ্ট আর কোন
রসূল নাই এবং কুরআনের সমতুল্য
আর কোন গ্রন্থ নাই ।

-হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪৫বর্ষ ।। ১৬শ সংখ্যা

২৪শে শাবান, ১৪১২ হিঃ ।। ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৯৮ বাংলা ।। ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ।। ভারত ২ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশে ১৫ পাউণ্ড ।।

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী ১৬শ সংখ্যা পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ)
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ ঃ রোযার মাহাত্ম্য ৬

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
অনুবাদক ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরব্বী ৭

জুমুআর খুৎবা ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আইঃ)
অনুবাদক ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী ৮

পবিত্র রমযান ও আমাদের করণীয়
মোহতারম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর ১৭

৬৮তম সালানা জলসায় হুযুর (আইঃ)-এর পয়গাম ২১

৬৮তম সালানা জলসা—৯২ তে

ন্যাশনাল আমীর সাহেবের উদ্বোধনী ভাষণ ২২

কবি ইকবাল ও আহমদীয়াত
আলহাজ্জ আহমদ সেলবর্সী ২৮

সংবাদ ৩৩

সম্পাদকীয়

মাহে রমযান ও আল কুরআন

মাহে রমযান তার সকল কল্যাণ ও বরকত নিয়ে আমাদের সৌভাগ্যের দার প্রান্তে সমুপস্থিত। মহান আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন কালামে বলেছেন — রমযান মাস, এতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে বা এর সম্বন্ধে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং মাহে রমযান আর আল্‌ কুরআনকে আলাদা করে দেখার অবকাশ নেই।

মাহে রমযানের কঠোর সাধনার শেষেই পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর বান্দাকে 'কদর' দানের ব্যবস্থা লুক্কায়িত রেখেছেন। আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ)-এর নিকটও কুরআনের মহান বাণী অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়েছিল ২৪শে রমযান তারিখে (জরীর)। তাঁর জীবনের শেষ রমযানে সমগ্র কুরআন ২ বার তাঁর নিকট সম্পূর্ণ নাযেল হয়েছিল। তিনি ছিলেন আল্‌ কুরআনের মূর্ত প্রতীক যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন— কানা খুলুকুহুল কুরআন।

আল্লাহ্‌তা'লা মহান কুরআনের হেফাযতের ভার নিজের জন্যে নির্ধারিত করে বলেছেন— আমরা এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি আর আমরাই এর রক্ষক। আল কুরআন সংরক্ষিত হয়ে আসছে ঐশী পরিকল্পনার ধারায়। নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতেও ইহা সংরক্ষিত হবে। আমরা যদি সঠিকভাবে আল কুরআনের ধারক ও বাহক হতে পারি নিঃসন্দেহে আমরাও সংরক্ষিত হবো। এ মহান মাহে রমযানে তাই আসুন আমরা আল্‌ কুরআনের আলোকে আলোকিত হই এবং এর ধারক ও বাহক হওয়ার সাধনায় নিয়োজিত হই আর মহান আল্লাহ্‌তা'লার আশ্রয়ের ছায়াতলে অবস্থান লাভ করি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৪৫তম বর্ষ ১৬শ সংখ্যা

২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২ইং : ২৯শে তবলীগ, ১৩৭১ হিঃ শামসী : ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ

কুরআন মজীদ

সূরা আল্‌ বাকারা-২

রমযানের সাধনা

১৮৪। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের উপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হইল, যেরূপে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের (২০৬) উপর ইহা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল যেন তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিতে পার।

২০৬। ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবে রোযা (উপবাস-ব্রত) পালন কোন না কোন আকারে সকল ধর্মেই পাওয়া যায়। "অধিকাংশ ধর্মগুলিতে এবং নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর কৃষ্টির মধ্যে, উপবাস-ব্রত একটি সাধারণভাবে নির্দেশিত ব্যাপার। আর যেখানে এই ধরণের নির্দেশ নাই, সেখানেও প্রাকৃতিক প্রয়োজনের তাকিদে অনেকেই উপবাস করিয়া থাকেন" (এনসাইবৃট)। সাধু পুরুষ ও দিব্য জ্ঞানীগণের অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মনের পবিত্রতা সাধনের জন্য শারীরিক সম্পর্কসমূহ কিছুটা ছিন্ন করা এবং সাংসারিক বন্ধন হইতে কতকটা মুক্তিলাভ একান্তই প্রয়োজন। তবে, ইসলাম এই উপবাস ব্রতের মধ্যে নবরূপ, নবঅর্থ ও নবতম আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আরোপ করিয়াছে। ইসলাম রোযাকে (উপবাস পালন) পূর্ণমাত্রায় আত্মোৎসর্গ স্বরূপ মনে করিয়া থাকে। ইহা আত্মবলিদানের প্রতীক। যিনি রোযা পালন করেন, তিনি যে কেবল শরীর রক্ষাকারী খাদ্য-পানীয় হইতে বিরত থাকেন তেমন নহে, বরং সন্তানাদি জন্মদান তথা বংশবৃদ্ধির ক্রিয়াকলাপ হইতে দূরে থাকেন। অতএব, যিনি রোযা রাখেন, তিনি তাহার প্রস্তুতির কথা জানাইয়া দেন যে, প্রয়োজন বোধে, তাহার প্রভু ও সৃষ্টিকর্তার খাতিরে তিনি তাহার সবকিছু, এমন কি তাহার জীবন পর্যন্ত কুরবানী করিয়া দিতে সামান্যও কুণ্ঠিত নহেন।

১৮৫। (ফরয রোযা) নির্দিষ্ট দিনগুলিতে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয় অথবা সফরে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইবে; এবং যাহাদের পক্ষে ইহা (রোযা রাখা) ক্ষমতাতীত, (২০৭) তাহাদের উপর 'ফিদিয়া'—এক মিসকীনকে আহার্য দান করা। অতএব, যে কেহ স্বেচ্ছায় পুণ্যকর্ম করিবে, উহা অবশ্য তাহার জন্য উত্তম হইবে। বস্তুতঃ তোমরা যদি জানিতে তাহা হইলে তোমাদের জন্য রোযা রাখাই কল্যাণকর হইবে।

১৮৬। রমযান (২০৭-ক) সেই মাস যাহাতে নাযেল (২০৮) করা হইয়াছে কুরআন (২০৭-খ) যাহা মানবজাতির জন্য হেদায়াত স্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকানের (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারীর) জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণাদি স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেহ এই মাসকে পায় সে যেন ইহাতে রোযা রাখে; কিন্তু যে কেহ রুগ্ন অথবা সফরে থাকে তাহা হইলে অন্য দিনে (২০৯) গণনা পূর্ণ করিতে হইবে; আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চাহেন এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চাহেন না, এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দিয়াছেন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

২০৭। 'ইয়ুতিকুনাহু'র অর্থ করা হইয়াছে, যাহাদের পক্ষে ইহা ক্ষমতাতীত বা যাহারা অতি কষ্টে ইহা (রোযা) করিতে পারে। অন্য পাঠ 'ইয়ুতাঈকুনাহু' এই অর্থকে সমর্থন করে (জরীর)। এই আয়াতে তিন শ্রেণীর বিশ্বাসীকে রোযার ব্যাপারে কিছুটা রেহাই বা সুবিধা দেওয়া হইয়াছে—অসুস্থ, ভ্রমণরত, এবং অতি দুর্বলদিগকে। 'ইয়ুতিকুনাহু'র অর্থ এখানে 'যাহারা রোযা রাখিতে অসমর্থ'' হইতে পারে (লিসান ও মুফরাদাত)। সমস্ত বাক্যটির অর্থ এইরূপও করা হইয়াছে, ''রোযা ছাড়াও অতিরিক্ত পুণ্য অর্জনের জন্য সামর্থ্যবান ও অবস্থা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ গরীবদিগকে খাওয়াইতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে 'ইয়ুতিকুনাহু'র 'হু' সর্বনামটি একজন গরীবকে ''খাওয়ানোর'' পরিবর্তে ব্যবহৃত হইবে।

২০৭-ক। 'রমযান' চান্দ্রমাসগুলির মধ্যে নবম মাস। শব্দটি 'রামাযা' ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'রামাযাস সায়মু' অর্থ রোযা করার কারণে রোযাদারের ভিতরটা তৃষ্ণায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে (লেইন)। মাসটির নামকরণ এই কারণে হইয়াছে: (১) রোযার কারণে এই মাসটিতে মানুষের তৃষ্ণা ও জ্বালা বৃদ্ধি পায়, (২) এই মাসের ইবাদত-বন্দেগী মানুষের পাপকে জ্বালাইয়া-পুড়াইয়া নিঃশেষ করে (আসাকির ও মারদাওয়াই), (৩) এই মাসে মানুষের তপস্যা ও সাধনা তাহার মনে স্রষ্টার প্রতি ভালবাসার উত্তাপ সৃষ্টি করে এবং মানবের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করে। 'রমযান' নামটিই ইসলামের অবদান। এই মাসটির পূর্ব নাম ছিল নাতিক (কাদীর)।

টিকা অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৮৭। এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তখন (বল), 'আমি নিকটে (২১০) আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দিই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। সুতরাং তাহারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান (২১১) আনে যাহাতে তাহারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।'

২০৭-খ। 'আল-কুরআন' শব্দটি 'কারাআ' হইতে উৎপন্ন। 'কারাআ' অর্থ সে পাঠ করিয়াছিল, সে বাণী পৌঁছাইয়াছিল, সে সংগ্রহ করিয়াছিল। 'কুরআন' অর্থঃ (১) গঠনের উপযোগী পুস্তক, যাহা বার বার পাঠ করা যায়; 'কুরআন বিশ্বের সর্বাধিক পঠনীয় পুস্তক' (এন্‌সাইক্লো-বৃট), (২) একটি পুস্তক কিংবা বাণী যাহা পৃথিবীর সর্বত্র নিয়ে যাওয়া ও পৌঁছান প্রয়োজন, কুরআনই একমাত্র পুস্তক যাহার বাণী সারা বিশ্বের জন্য সম্পূর্ণরূপে অবারিত। কেননা, যেখানে অন্যান্য অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থাদি স্থান কাল ও পাত্রে সীমাবদ্ধ, সেখানে কুরআনই একমাত্র অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থ যাহা সকল দেশ, সকল জাতি ও সকল সময়ের জন্য আসিয়াছে (৩৪:২৯), (৩) এমন গ্রন্থ যাহা সকল সত্যকে ধারণ করে; কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যাহা যাবতীয় জ্ঞানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। ইহাতে অন্যান্য অবতীর্ণ গ্রন্থাবলীর শাশ্বত সত্যগুলি তো স্থান পাইয়াছে, উপরন্তু সর্বাবস্থায় সকল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক নতুন শিক্ষা ও সত্য ইহাতে সংযোজিত হইয়া ইহা সর্বকালের জন্য পূর্ণতম গ্রন্থে পরিণত হইয়াছে (৯৮:৪, ১৮:৫০)।

২০৮। রমযান মাসেরই চব্বিশ তারিখে হযরত রসূল করীম (সাঃ) প্রথম আল্লাহ্‌র বাণী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (জরীর)। এই রমযান মাসেই জিবরাঈল প্রতি বৎসর পূর্বে নাযেলকৃত সমস্ত বাণী রসূল করীম (সাঃ)-এর নিকট পুনরাবৃত্তি করিতেন। এই ব্যবস্থা মহানবী (সাঃ)-এর জীবনের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তাঁহার জীবনের শেষ বৎসরের রমযান মাসে প্রধান ফিরিশ্‌তা জিব্‌রাঈল পূর্ণ কুরআনকে মহানবী (সাঃ)-এর কাছে দুইবার পাঠ করিয়া শুনান (বুখারী)। এই হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, সমগ্র কুরআনই রমযান মাসে অবতীর্ণ হইয়াছে।

২০৯। এই বাক্যটি অপ্রয়োজনীয় পুনরুক্তি নয়। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতে মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতির ক্ষেত্র গঠনের জন্য এই বাক্যটি ব্যবহৃত হইয়াছিল, যাহাতে রোযা রাখার নির্দেশ তাহারা সহজেই গ্রহণ করিতে পারে। এই আয়াতে ঐ নির্দেশেরই বাস্তবায়নকে উপলক্ষ্য করিয়া এই বাক্যটি ব্যবহৃত হইয়াছে। বাক্যটি ঐ নির্দেশেরই অঙ্গ-বিশেষ। অসুখ, ভ্রমণ শব্দগুলিকে সংজ্ঞায়িত না করিয়া কুরআন মানুষের সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে শব্দগুলি সংজ্ঞায়িত করার ভার ছাড়িয়া দিয়া বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা দেখাইয়াছে।

টিকা অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৮৮। রোযার রাত্রে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রী-গমন বৈধ করা হইয়াছে। তাহারা তোমাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক, (২১২) এবং তোমরা তাহাদের জন্য এক প্রকারের পোশাক। আল্লাহ্ অবগত আছেন যে, তোমরা তোমাদের নিজেদের অধিকার খর্ব করিতেছিলে, অতএব, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তোমাদের এই অবস্থার সংশোধন (২১৩) করিলেন। অতএব, এখন তোমরা তাহাদের নিকট গমন কর এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যাহা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন উহা অনুসন্ধান কর; এবং তোমরা আহার কর এবং পান কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের নিকট উষার শুভ্র রেখা কৃষ্ণরেখা হইতে পৃথক দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর, রাত্রি (২১৪) (আগমন) পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর; এবং তোমরা মসজিদ (২১৫) সমূহে যখন এ'তেকাফে থাক তখন স্ত্রী গমন করিও না। এইগুলি হইতেছে আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ, অতএব, তোমরা ইহাদের নিকটে যাইও না; এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার নিদর্শনাবলী মানবজাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যেন তাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

২১০। যখন মানুষ রমযান মাসের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ও এই মাসে রোযা রাখার পুণ্য ও আশীর্বাদরাশির সম্বন্ধে অবগত হয়, তখন তাহারা স্বভাবতঃই ইহা হইতে খুব বেশী আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের আশা পোষণ করিয়া থাকে। মুমেনের এই আশা-আকাংখার প্রত্যুত্তরে, এই আয়াতটি মুমেনের আত্মাকে নিশ্চয়তা দান করিতেছে।

২১১। "আমার উপর ঈমান আনে" এই বাক্যটির অর্থ এই স্থলে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে ঈমান আনা বা বিশ্বাস না করার অর্থে নহে। কারণ পূর্ববর্তী বাক্যে বলা হইয়াছে "তাহারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয়"। অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিলে সাড়া দেওয়ার কথাই আসিত না। অতএব, "আমার উপর ঈমান আনে" অর্থ এই কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ তাঁহার বান্দার প্রার্থনা শুনেন এবং মঞ্জুর করেন।

২১২। কি চমৎকার একটি মাত্র বাক্যে কুরআন স্ত্রীলোকের অধিকার ও মর্যাদাকে বর্ণনা করিয়াছে এবং বিবাহের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে বর্ণনা করিয়াছে। এই আয়াত বলিতেছে—বিবাহের উদ্দেশ্য হইল দম্পতির শান্তি লাভ, আত্মসংরক্ষণ এবং সৌন্দর্যবর্দ্ধন। কেননা পোশাকের কাজও তাহাই (৭:২৭, ১৬:৮২)। বিবাহের উদ্দেশ্য কেবল কাম-বৃত্তি চরিতার্থ করা নহে। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে মন্দকাজ ও কুৎসা হইতে রক্ষা করা।

২১৩। "আফা আল্লাহু আনহু" অর্থ আল্লাহ তাহার ভ্রম সংশোধন করিয়া, তাহার কাজকর্ম ঠিক করিয়া দিলেন; আল্লাহ তাহাকে সম্মান দিলেন। ইহার অন্য এক অর্থ হইল আল্লাহ তাহাকে উদ্ধার করিলেন (মুহীত)।

টিকা অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৮৯। আর তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ (২১৫-ক) তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অন্যায়ভাবে (২১৬) গ্রাস করিও না, ও উহাকে কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিও না যাহাতে লোকের ধন-সম্পদের কোন অংশ তোমরা জানিয়া শুনিয়া অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিতে পার।

২১৪। যে সব দেশে দিন ও রাত্রি অতিমাত্রায় দীর্ঘ (যেমন মেরু অঞ্চলে) সেখানে দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ প্রতি ঘন্টার হিসাবে গণনা করিতে হইবে (মুসলীম, বাবু আশরাত আস্‌সায়াত)

২১৫। এ'তেকাফে থাকা অবস্থায় দিনে এবং রাত্রিতে স্ত্রী-গমন কিংবা তৎসন্নিহিত অন্য কিছু নিষিদ্ধ। কেননা, রোযার আত্মিক সুফলকে পূর্ণতার দিকে পৌঁছানোর জন্য দিবা-রাত্র চেষ্টা-সাধনা করার নামই এ'তেকাফ।

২১৫-ক। সাম্প্রদায়িক ঐক্যকে জোরদার করিবার উদ্দেশ্যে মুসলমানের ধন-সম্পদকে কুর-আনে 'তোমাদের ধন-সম্পদ' বলিয়া অনেক সময় উল্লেখ করা হইয়াছে! এখানেও "তোমাদের ধন-সম্পদ" বলিতে মুসলমানদের ধন-সম্পদ বুঝাইতেছে।

২১৬। রোযা রাখার নির্দেশ মুসলমানদের উপর কর্তব্য নির্ধারণ করিয়াছে যে, তাহারা যেন একটা নির্দ্ধারিত সময় ব্যাপী খাদ্য ও পানীয় হইতে বিরত থাকে, যাহাতে তাহাদের মধ্যে পুণ্য ও ধর্ম-পরায়ণতা জাগ্রত হয়। তাই, ইহাই উপযুক্ত সময়, যখন তাহাদিগকে মনে করাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, তাহারা যেন অবৈধ খাদ্যাদি হইতে বিরত থাকে অর্থাৎ তাহারা যেন সজ্ঞানে অবৈধ উপার্জন হইতে আত্মরক্ষা করে। কথাচ্ছলে, এই আয়াত ঘুষ দেওয়া নেওয়াকে অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ বলিয়া নিন্দা করিয়াছে।

(৭ম পাতার পর)

অর্থাৎ—অসুস্থ ও সফররত ব্যক্তির পক্ষে রোযা রাখা সঙ্গত নয়। ইহা খোদার আদেশ। আল্লাহ্‌তা'লা এরূপ নির্দেশ দেন নাই যে, রোযা যাহার ইচ্ছা রাখুক অথবা যাহার ইচ্ছা না রাখুক। যেহেতু অধিকাংশ লোক সাধারণতঃ সফরে রোযা রাখিয়া থাকে, সেই হেতু যদি তাহারা প্রচলিত প্রথা বিবেচনা করিয়া রোযা রাখে, তাহা হইলে তাহারা রাখুক, কোন আপত্তি নাই, কিন্তু এতদসত্ত্বেও عدة من ايام اخر অর্থাৎ (অন্য সময়ে সেই রোযা পুরা করিতে হইবে)—আয়াতে উল্লিখিত আদেশ পালনের প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত।"

(আল্‌-হাকাম, ৩১শে জানুয়ারী, ১৮৯৬)

৫। (ক) "সফরে কষ্ট স্বীকার করিয়া যাহারা রোযা রাখিয়া থাকে তাহারা প্রকা-রান্তরে আল্লাহ্‌তা'লাকে বল-পূর্বক সন্তুষ্ট করিতে চাহে। আল্লাহ্‌র হুকুম মান্য করিয়া আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চাহে না। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। আল্লাহ্‌র আদেশ এবং নিষেধ উভয়ই মান্য করার মধ্যে সতিকার ঈমান নিহিত। (আল-হাকাম, ৩১শে জানুয়ারী, ১৮৯৬)

(খ) "শরীয়তের ভিত্তি কাঠিন্যের উপর নহে বরং যাহাকে তোমরা সচরাচর সফর বলিয়া থাক তাহাই সফর। যেমন খোদাতা'লার নির্দেশিত ফরয (বাধ্যকর) বিষয়াবলীর উপর আমল করিতে হয়, তেমনিভাবে তাহার অনুমোদিত সুবিধা পালন করাও অবশ্য কর্তব্য।"

(আল-হাকাম, ঐ)

হাদিস শরীফ

রোযার মাহাত্ম্য

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন রমযান মাস আসে আসমানের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়। অপর বর্ণনায় রহিয়াছে। বেহেশ্‌তের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয় এবং দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয় আর শয়তানকে শৃংখলিত করা হয়। অপর বর্ণনায় আছেঃ রহমতের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়। (মোত্তাফেক আলায়হে)

(২) হযরত সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশ্‌তে আটটি দরজা রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি দরজার নাম 'রায়্যান'। রোযাদারগণ ব্যতীত ঐ দরজা দিয়া আর কেহই প্রবেশ করিতে পারিবে না।

(মোত্তাফেক আলায়হে)

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মানব সন্তানের পুণ্যকর্ম বাড়ান হইয়া থাকে; প্রত্যেক পুণ্যকর্ম দশ গুণ হইতে সাত শত গুণ পর্যন্ত। আল্লাহ্ বলেন, রোযা ব্যতীত; কেননা রোযা আমারই জন্য এবং আমিই ইহার প্রতিফল দান করিব (যত ইচ্ছা তত)। সে আমারই জন্য আপন প্রবৃত্তি ও খাদ্য-পানীয়ের জিনিস ত্যাগ করে।

রোযাদারের জন্য দুইটি (প্রধান) আনন্দ রহিয়াছেঃ একটি তাহার ইফ্‌তারের সময় এবং অপরটি বেহেশ্‌তে আপন প্রভুর সাক্ষাৎ লাভের সময়। নিশ্চয় রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট মেশ্‌কের সুগন্ধি অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধিময়। রোযা হইতেছে মানুষের জন্য (দোযখের আগুন হইতে রক্ষার) ঢাল স্বরূপ। সুতরাং যখন তোমাদের কাহারও নিকট রোযার দিন আসে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং অনর্থক শোরগোল না করে। যদি কেহ তাহাকে গালি দেয় অথবা তাহার সাথে ঝগড়া করিতে চাহে সে যেন বলে, আমি একজন রোযাদার (মুত্তাফেক আলায়হে)।

(৪) হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছেঃ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, রোযা এবং কুরআন (কেয়ামতে) আল্লাহ্‌র নিকট বান্দার জন্য সুপারিশ করিবে। রোযা বলিবে, হে প্রভু! আমি তাহাকে দিনে তাহার খাবার ও প্রবৃত্তি হইতে বাধা দিয়াছি, সুতরাং তাহার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন আর কুরআন বলিবে, আমি তাহাকে রাত্রে নিদ্রা হইতে বাধা দিয়াছি সুতরাং তাহার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। (বায়হাকী)

(৫) হযরত আনাস বিন্ মালেক (রাঃ) বলেন, একবার রমযান মাস আসিল। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমাদিগকে বলিলেন, এই মাস তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে এমন একটি রাত্র রহিয়াছে যাহা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে উহার কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে সে সর্বপ্রকার কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, আর উহা হইতে চির বঞ্চিত ব্যক্তি ব্যতীত কেহই বঞ্চিত হয় না। (ইবনে মাজা)

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদক : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্মুদ, সদর মুরব্বী

রোযা রাখার পুরস্কার অতি মহান তাহাতে সন্দেহ নাই
রোযা হৃদয়ে উজ্জলতা দান করে ও কাশ্‌ফের দ্বার উন্মুক্ত করে

১। "আরবী ভাষায় সূর্যের তাপকে 'রময' বলা হয়। রমযান মাসে রোযাদার পানাহার ও যাবতীয় দৈহিক ভোগ-বিলাস হইতে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্‌র আদেশসমূহ পালন করিবার উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণে এক প্রকার ব্যগ্রতার তাপ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, এই আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকার তাপের সংমিশ্রণে রমযান সৃষ্টি হইয়াছে। আভিধানিকগণ বলিয়া থাকেন যে, রমযান গ্রীষ্মকালে আসিয়াছিল বলিয়াই উহাকে রমযান বলা হইয়াছে। আমার মতে এই ধারণা সঠিক নহে। কেননা আরব দেশের জন্য ইহাতে কোন বিশেষত্ব থাকিতে পারে না। আধ্যাত্মিক তাপের অর্থ আধ্যাত্মিক অনুরাগ ও ধর্ম-কর্মে উদ্দীপনা। 'রময' এমন উত্তাপকেও বলা হয় যদ্দারা পাথর প্রভৃতি পদার্থও উত্তপ্ত হয়।"

(আল্ হাকাম, ২৪শে জুলাই, ১৯০৯)

২। "রমযান মাস অতি মঙ্গলজনক মাস। কেননা ইহা দোয়ার মাস।" (ঐ)

৩। "شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن" কুরআন শরীফের এই একটি মাত্র পবিত্র বাক্য হইতে রমযান মাসের মাহাত্ম্য বুঝা যায়। (এই আয়াতের অর্থ—রমযান সেই পবিত্র মাস, যাহার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে। — অনুবাদক।) (ঐ)

সুফীগণ লিখিয়াছেন যে, এই মাসে আত্মাকে জ্যোতির্ময় করার উত্তম সুযোগ পাওয়া যায়। এই মাসে বহুল পরিমাণে 'কাশ্‌ফ' (আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা) লাভ হইয়া থাকে।

নামায "তায্‌কিয়া-নফস" (আত্ম-শুদ্ধি) সাধিত করে এবং রোযায় 'তাজাল্লিয়ে-কল্‌ব' সাধিত হয়। "তাযকিয়া-নফস" (আত্ম-শুদ্ধি)-এর অর্থ রিপু দমন শক্তির বৃদ্ধি লাভ। 'তাজাল্লিয়ে-কল্‌ব' (আত্মার উজ্জলতা) সাধিত হওয়ার অর্থ—"কাশ্‌ফ" বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞানের দুয়ার উন্মুক্ত হইয়া খোদা-দর্শন লাভ করা।

সুতরাং انزل فيه القرآن (অর্থাৎ এই মাসে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে) পবিত্র আয়াতে ইহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, রোযার প্রতিদান অতি মহান। কিন্তু দৈহিক অবস্থা ও পার্থিব স্বার্থ মানুষকে এই কল্যাণ লাভ হইতে বঞ্চিত রাখে।"

(বদর, ১লা ডিসেম্বর, ১৯০২)

৪। কুরআন করীম হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে,

فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

(অবশিষ্টাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

জুমু'আর খুতবা

[২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ইং লণ্ডন মসজিদে ফযলে প্রদত্ত]

অনুবাদক : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
সদর মুরব্বী

মালী নেযাম অর্থনৈতিক বিধান ও ব্যবস্থা-এর ক্ষেত্রেও কুরআন করীম পুনরায় সর্বোৎকৃষ্ট নেযাম (ব্যবস্থা) আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছে।

এই ব্যবস্থা জগতে কোথাও প্রচলিত থেকে থাকলে একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'তেই তার একটা দিক বা অংশ প্রচলিত আছে যা হ'ল স্বেচ্ছায় চাঁদা দানের ব্যবস্থা।

আজকের যুগে একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে এ বিষয়টিতেও রূপ দান করেছে।

যাদের অন্তরে লাযেমী (বাধ্যতামূলক) চাঁদাসমূহের প্রতি অবজ্ঞা ও অনিহা পরিলক্ষিত হয় অথবা স্বেচ্ছাগত তাহরীকসমূহের ক্ষেত্রে যারা নিজেদের অন্তরে সংকোচ ও বোঝা অনুভব করেন তাদের উচিত নিজেদের আত্ম বিশ্লেষণ করা।

তাশাহুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর বলেন :

ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ٥ ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربت عندالله وصلوت الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله فى رحمته ان الله غفور رحيم ٥ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنت تجرى تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ٥

(অর্থাৎ "মরুবাসী আরবদের মধ্যে কতক এমনও আছে যে, তারা যা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে উহাকে জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের (নৈসর্গিক) বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে। তাদের উপরই মন্দ বিপর্যয় (পতিত) হবে। এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

মরুবাসী আরবদের মধ্যে এমনও আছে যারা আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান আনে এবং (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) যা খরচ করে উহাকে তারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও রসূলের দোয়া লাভের উপায় মনে করে। শুন! বাস্তবিকই উহা তাদের জন্য আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের

উপায় হবে, অচিরেই আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় রহমতে প্রবিষ্ট করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।''

অতঃপর হুযুর বলেন, কুরআন করীম যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (মালি নেযাম) দুনিয়ার সামনে পেশ করেছে তা এক সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা বা নেযাম, যার কোন নজির দুনিয়ার অন্য কোন ধর্মে পরিলক্ষিত হয় না। এ বিষয়টি স্বীয় স্বকীয়তায় এতই ব্যাপক এবং গভীর যে, কোন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর দৃষ্টি যদি উক্ত বিষয়টির দিকে আকৃষ্ট করা হয় এবং তাকে আহ্বান করা হয় যে, আপনি শুধু আপনার ধর্মই নয়, বরং দুনিয়ার অন্যান্য সকল ধর্ম থেকে খোদার উদ্দেশ্যে মালী কুরবানী সংক্রান্ত শিক্ষা ও নীতিমালা সংগ্রহ করুন এবং আমরাও কুরআন করীম থেকে এতদসংক্রান্ত আয়াত পেশ করবো। তারপর দেখুন, কুরআন করীমের শিক্ষামালা প্রবল ও শ্রেয়ঃ সাব্যস্ত হয়, না সমগ্র জগদ্ব্যাপী সকল কিতাবের সমষ্টিগত শিক্ষা কুরআন করীমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত হয়। আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এতদবিষয়ে তুলনা করে দেখেছি। যদিও সার্বিকভাবে সব ধর্মের শিক্ষামালার উপর খুব গভীর দৃষ্টি দানের সুযোগ আমার হয়ে উঠেনি, কিন্তু ধর্মাবলীতে তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণের শখ আমার রয়েছে, তাই আমি মূল গ্রন্থাবলীও পাঠ করেছি। পরবর্তীকালীন বই-পুস্তকও পড়েছি এবং সেগুলির উপর পক্ষে-বিপক্ষে যেসব পর্যালোচনা বিরচিত হয়েছে তাও অনেকাংশে পাঠ করার সুযোগ আমার ঘটেছে। সেজন্য আমি সাক্ষ্য জ্ঞানের ভিত্তিতে ঐ কথাটি বলছি; (স্বধর্মে) অনুরাগ জনিত কোন দাবীর ভিত্তিতে নয়। কুরআন করীমের প্রতি প্রত্যেক মুসলমানের ভক্তি-ভালবাসা আছে। সে ইহার সম্বন্ধে বিভিন্ন রকম উঁচু দাবীও করে। কিন্তু হযরতে আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ) আহ্‌মদীয়াতকে যে নতুন ভঙ্গী শিক্ষা দিয়েছেন তা হলো এই যে, কেবল ভক্তি ভালবাসা-ভিত্তিক দাবী উচ্চারণ করো না। নিজে দেখ, পরখ কর, খুব ভালভাবে নিরীক্ষণ ও চিন্তা ভাবনা করার পর কথা বল। অতএব এই কথা যে, আমি বলছি তা সম্পূর্ণ গবেষণা করার পরেই বলছি। আপনাদের মধ্যে প্রত্যেক আহ্‌মদীই এ ব্যবস্থা-পত্রটি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। সে কখনও সারা জগতের ধর্মাবলীর সমষ্টিগত শক্তির কাছেও উক্ত বিষয়ে পরাজয় বরণ করবে না। এই শিক্ষা এতো ব্যাপক—ব্যক্তিগত দিক দিয়েও এবং সমষ্টিগত দিক দিয়েও, আর তেমনি এতো গভীর দর্শন ও তত্ত্ব-ভিত্তিক এবং প্রতিটি উঁচু-নীচুকে এরূপ (পুঙ্খানুপুঙ্খ) ভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মালী কুরবানী সম্পর্কিত নেযামের ইহা যেন এক পূর্ণাঙ্গ জগৎ—স্বয়ং সম্পূর্ণ যার মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটতে পারে না। এতো সবিস্তারে এ বিষয়টি বুঝাবার এ জন্যে প্রয়োজন যে, আজ যে নিত্যনতুন ফেৎনা উদ্ভাবিত হচ্ছে তাতে প্রায়শঃ প্রশ্ন তোলা হয় যে, ''ইসলাম ধর্ম কিরূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে গেল? দুনিয়া প্রগতিশীল ও ক্রমঅগ্রসরমান এবং প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই পূর্বাপেক্ষা কোন না কোন আকারে অগ্রগতির আভাস ও চিহ্নাবলী পরিলক্ষিত

হয়। (এমতাবস্থায়) আমরা কি একটা স্থবির ধর্মকে মেনে নিব? যা নিজ কাণ্ডে দণ্ডায়মান এবং অতীতকালের কোন এক বিন্দু বা মাত্রায় এসে জমে গেছে, স্থবির হয়ে পড়েছে। সেখান থেকে আর অগ্রসর হচ্ছে না।" এই অভিযোগ বা আপত্তি সরল প্রাণ মুসলমানদের উপর কুপ্রভাব বিস্তার করে। কোন কোন সময়ে তাদের প্ররোচনা ও পদস্খলনের কারণ হয়ে যায়। সুতরাং আজকাল "জয়-সিন্ধু" আন্দোলনের ক্ষেত্রেও সৈয়দ সাহেব যে জীবন দর্শনটি পেশ করেছেন তাতে প্রকটরূপে এ কথাই উত্থাপন করেছেন যে, "কুরআনিক শিক্ষা স্বীয় যুগে ভালই ছিল কিন্তু পুরাণ এবং সেকেলে হয়ে গেছে। চৌদ্দ শ' বছর পূর্বেকার কথাবার্তা আমরা কি করেই বা মেনে নিতে পারি? চৌদ্দ শ' বছর পূর্বের কিতাব আজ কি করেইবা আমাদের পথ-প্রদর্শন করতে পারে?" অতএব, তাদের জন্যেও এটা এক চ্যালেঞ্জ। কেবল ধর্মেরই নয় বরং সমগ্র বিশ্বের আর্থিক ব্যবস্থা যা আজ পর্যন্ত মানবীয় চেষ্টা-প্রয়াসের ফসল স্বরূপ বিদ্যমান, সেগুলোকে দর্শনসহ যাচাই করে নিন, সমষ্টিগত সে সবগুলোকে আহ্বান করুন, আপনারা সকলে একজোট হয়ে নিজ নিজ ফিলসফি এবং নিজ নিজ ব্যবস্থা থেকে শীর্ষস্থানীয় তত্ত্বসমূহ নির্ণয় করে উপস্থিত করুন। তারপর ইসলামের মালী কুরবানীর নেযাম ও ব্যবস্থার সাথে সেগুলির মুকাবিলা ও তুলনা করুন। তারপর বলুন (চিহ্নিত করুন) ইসলামের মালি নেযামের মধ্যে কোথায় কি সংশোধন এবং উন্নতির সুযোগ বা প্রয়োজন আছে। কার্যতঃ কিছু করে দেখান, তাহলে আমরা মানবো। কেবল হেয়ালী সমালোচনার উপর তো মানুষ তার ধর্মীয় ভাবধারা ও নীতিমালার পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। অতএব, এ সেই নেযাম, যে সম্বন্ধে প্রত্যেক আহ্‌মদীর কর্তব্য উত্তমরূপে ওয়াকেফহাল হওয়া! কার্যতঃ তারা ওয়াকেফহাল হচ্ছেও এবং (ইসলামের) এই বিধিসম্মত ব্যবস্থা (নেযাম) দুনিয়াতে যদি কোথাও প্রবর্তিত ও সচল থেকে থাকে, তাহলে কেবল আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তেই উহার একটি দিক প্রবর্তিত রয়েছে অর্থাৎ স্বেচ্ছামূলক চাঁদার যে ব্যবস্থাটি তা আহ্‌মদীয়া জামা'তে সচল ও সক্রিয় হয়ে পড়েছে এবং এর সৌন্দর্য ও মহিমায় উন্নত হয়ে চলেছে। দৈনন্দিনই অধিকতর বিকশিত হয়ে সামনে উপস্থিত হচ্ছে এবং এই নতুন সাজ-সজ্জার পথে এমন কোন যৎকিঞ্চিৎ উপলক্ষ্যও উপস্থিত হয় না যাতে কুরআনী শিক্ষামালাতে পরিবর্ধনের আবশ্যক হয়। বস্তুতঃ এর গণ্ডী ও পরিধির মধ্যে এই যাবতীয় উন্নতি সাধিত হচ্ছে এবং এর সীমা রেখার ভেতরে অবস্থান করে আমরা জানি যে, এখনও অনেক উন্নতি ও অগ্রগতির সুযোগ রয়েছে।

অতএব, আজ হিজরী পনর বা চৌদ্দ শতাব্দীর মানুষ ঘাড় ফিরিয়ে পথ প্রদর্শনের জন্যে দৃষ্টিপাত করে এবং যখন কুরআন করীমের শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হবার চেষ্টা করে তখন বিস্ময়াবাক হয় যে, এখনও তো সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেক কিছুই বাকী পড়ে আছে এবং বাস্তবিক পক্ষে কুরআন করীম যুগের শেষ (মুহূর্তে) অবধি মানবজাতির সঙ্গ দিবে—তারা সঙ্গ দিতে পারুক বা না পারুক তা স্বতন্ত্র ব্যাপার; কিন্তু কুরআন করীমের শিক্ষা ও অনুশাসন কোন পার্থিব চিন্তা-চেতনা অথবা পার্থিব উন্নতি-অগ্রগতি থেকে পিছিয়ে থাকতে পারে না।

মোট কথা, এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ভূমিকার পর আমি একটি বিশেষ দিক জামাতের সামনে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরতে চাই।

কুরআন করীম দুই প্রকারের মালী কুরবানীকারীদের অবস্থা বর্ণনা করেছে, যা মরুবাসী আরবদের উদ্ধৃতি সূত্রে বর্ণনা করেছে। সেটিতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দ্বারা তরবীয়াত প্রাপ্ত গোলামদের উল্লেখ নেই। সেজন্যে খুব ভালভাবে মনোনিবেশ করে নিন যে, (প্রারম্ভে পঠিত) এই আয়াতগুলির মধ্যে প্রথম আয়াতটি একান্তরূপে মরুবাসী আরবদের উপরেই প্রযোজ্য হয় অর্থাৎ ঐ সকল মরুবাসীদের উপর যারা সামাজিক ও সমষ্টিগতভাবে ইসলামকে গ্রহণ করে নিয়েছিল বটে, কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ)-এর তরবীয়াত দ্বারা কল্যাণপ্রাপ্ত হতে পারেনি। কিন্তু হুযুর আকরাম (সাঃ)-এর পবিত্র করণ শক্তি এমনই (বা এতই) প্রবল ছিল যে, ঐ অন্ধকাররাশিকেও ভেদ করে, সেগুলিকেও ছাড়িয়ে যায় এবং তাদের মধ্যেও বহু স্থলে নূরের অতীব সুন্দর মশাল জেলে দেয়। উক্ত বিষয় বর্ণনা করে দ্বিতীয় আয়াতটি। আর তৃতীয় আয়াতটি বর্ণনা করে এই যে, নমুনা ও আদর্শগত দৃষ্টান্ত সেটিই যা ছিল আনসার ও মুহাজেরীনের নমুনা। মরুবাসী আরবদের মধ্যে মন্দও আছে, ভালও আছে, অতি সুন্দর কুরবানীকারীগণও আছেন: কিন্তু নমুনা ও দৃষ্টান্ত তোমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবা-সাথী আনসার ও মুহাজেরীনকেই। কেননা তাঁরা হলেন আঁ-হুযুর (সাঃ)-এর তরবীয়াতপ্রাপ্ত। প্রথম আয়াতটিতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ

—ঐ সকল মরুবাসী আরবদের মধ্যে বহু এরূপও আছে, তারা (আল্লাহ্র পথে) যাই খরচ করে তা তারা জরিমানা মনে করেই খরচ করে এবং কষ্ট অনুভব করতে থাকে এবং সঙ্গে গোপনে তোমাদেরকে বদ-দোয়া দিতে থাকে এই বলে যে, এরা আমাদেরকে কি বিপদে না ফেলেছে! আমাদের ধন-সম্পদ হতে অংশ নিতে এসে যায়। খোদা করুন যেন এদের উপর নৈসর্গিক দুর্ঘটনামূলক বিপদ আপতিত হয় এবং এই ধরণের বিপদে পড়ে তারা বিপর্যস্ত হয়।

এই বিষয়বস্তু থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এটা ইসলামের প্রাধান্য লাভের সময়কার কথা যখন ইসলাম এতখানি আধিপত্য লাভ করেছিল যে, শাসন ক্ষমতাও আঁ-হযরত (সাঃ) এবং তাঁর গোলামদের হাতে ছিল এবং আরবদের উপর এক ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিল। যদি তা না হতো, তাহলে জরিমানা সংক্রান্ত কথা হতো না, এবং এতেই প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যতের ফেৎনাগুলির সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীও নিহিত ছিল যে, যখনই শাসন-ব্যবস্থা (প্রশাসন) শিথিল হবে, তখন তোমাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হবার জন্যে অপেক্ষমান ছিল তারা যেন মুক্তি পেতে পারে। তারা যে তখন আল্লাহ্র পথে অর্থ দান

বন্ধ করে দিবে শুধু তাই নয় বরং তাদের বিদ্রোহাত্মক ধ্যান-ধারণাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে এবং হট্টগোল সৃষ্টি করবে। সুতরাং এই আয়াতের আলোকে একথা বলা যে, নাউযুবিল্লাহ হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর চোখ বুজতেই যা-কিছু তাঁর সংস্কারকার্য ছিল তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং বিশৃংঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে যায়—নিছক একটা অজ্ঞতাপূর্ণ আপত্তি বৈ আর কিছুই নয়।' পাশ্চাত্যের পক্ষ থেকেও এবং প্রতীচ্যের কোন কোন চিন্তাবিদের পক্ষ থেকেও সর্বদা এ প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় যে, "আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এতো দীর্ঘকালীন পরিশ্রম পণ্ড হলো। তেইশ বৎসর ব্যাপী তরবীয়তের (নৈতিক ও আত্মিক প্রশিক্ষণ) পর সহসা যখন তিনি ইন্তেকাল করেন, তখন মরুবাসী আরবরা বিদ্রোহে তৎপর হয়ে উঠে এবং ধর্মত্যাগ ও যাকাত অনাদায়ের ফেৎনা শুরু হয়ে যায়।" বস্তুতঃপক্ষে কুরআন করীম তো (নবুওয়াত কালের) শেষ দিকটাতে যখন পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল সে দু' তিন বছরের অনধিক কালটির সম্বন্ধে বলছে যে, মরুবাসী আরবদের মধ্য একটা বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠই এরূপ যে আন্তরিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে নাই এবং আর যাই হোক এতটা (গভীর অন্তরে) গ্রহণ করে নাই যে, তারা খোদার পথে কিছুও ব্যয় করতে পারে। যা দেয় সেটাকা জরিমানা স্বরূপ মনে করে একান্ত অনিচ্ছায় বাধ্যতামূলকভাবে দেয়, আর অন্তরে ঘৃণা চেপে রেখেছে এবং তারা মুমেনদের অকল্যাণকামী, তাদের উপর নৈসর্গিক বিপৎপাতের জন্যে পথ চেয়ে আছে। কিন্তু কুরআন করীম নিজস্ব ধারা অনুযায়ী কোন জাতিকেই সমষ্টিগতভাবে (তাদের সকলকে) অভিযুক্ত করে না, সার্বিকরূপে কোন জামাতকে অপরাধী সাব্যস্ত করে না, বরং বাস্তবতঃ যাদের বাদ দেয়া যায় তাদেরকেও চিহ্নিত করে। সুতরাং আল্লাহ্ বলেন ঃ

و من الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই মরুবাসী আরবদের মধ্য থেকে — যারা তখন স্বল্পকালীনই তরবীয়াত পেয়েছিল এরূপ অসাধারণ ব্যক্তিত্বরাও গড়ে উঠেছিল ("মাই ইউমিনু বিল্লাহে ওয়াল ইওমিল আখিরে") যারা আল্লাহ্ এবং আখেরাতের উপর ঈমান আনে; "ওয়া ইয়াত্তাখিযু মা ইউন্‌ফিকু কুরুবাতিন ইন্দাল্লাহে ওয়া সালাওয়াতির রাসূল" — এবং যা কিছুই খোদার পথে ব্যয় করে তার কেবল দু'টিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যে ঃ (১) আল্লাহ্‌তা'লার নৈকট্য যেন লাভ করতে পারে এবং (২) রসূলের দোয়া যেন তাদের হাসিল হয়। এ ছাড়া আর কোন কিছুই তাদের কাম্য নয়। যখন অর্থ দান করে তখন তারা ভুলে যায় কি বা কি জন্য দিলো। (ঈপ্‌সিত) প্রতিদান তাদের এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, খোদা-তা'লা তাদেরকে নৈকট্য দিন এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দোয়া তাদের পৌঁছুক। "আলা ইন্নাহা কুরবাতুল্‌ লাহুম" — তাদের এই ভঙ্গী বা ভূমিকাটিই 'নৈকট্য' সৃষ্টি করে দিচ্ছে। উহা মালি কুরবানীর এতোই প্রিয় ও মনোরম ভঙ্গিমা যে, ঐশী নৈকট্য তারা পেয়ে গেল বৈ কি। "আলা ইন্নাহা কুরবাতুল্‌ লাহুম" বাণীটিতে অতীব সুন্দর বিষয়বস্তু

বর্ণিত হয়েছে। এ কথা বলা হয় নাই যে, "হ্যা! আমরা ওয়াদা করছি যে, তোমাদেরকে নৈকট্য প্রদান করা হবে অথবা এর ফলশ্রুতিতে তোমরা ইহা পাবে।" (বরং) বলা হয়েছে, انها قربة — মালি কুরবানীর এ ভঙ্গীটিই সাক্ষাৎভাবে 'নৈকট্য'। এমনটি তাদেরই সৌভাগ্যে ঘটে, যারা খোদাতা'লার নিকটবর্তী ও নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। এই হলো বিষয়বস্তু অর্থাৎ প্রতিদানের বিষয়বস্তু তো পরবর্তীর কথা। তা তো যথাস্থ কায়েম আছে বৈ কি। "ইন্নাহা কুরবাতুন"-এর (আসল) অর্থ এই যে, উক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর (অনুসারী) লোক, যারা ঐরূপে মালি কুরবানী পেশ করে থাকে, তারা তো বস্তুতঃ পূর্বাহ্নেই ঐশী নৈকট্যের অধিকারী বটে। খোদার নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য যাদের হয়নি, এতো মনোরম ভঙ্গী তাদের পক্ষে অনুশীলিত (বা সংঘটিত) হতেই পারে না। খোদাতা'লার কি যে অদ্ভূত কালাম! মানুষের তাতে বিস্ময়াবিভূত হতে হয়। একটু থেমে থেমে গভীর মনোনিবেশে যদি পাঠ করেন, আশ্চর্যকর লীলাখেলাসমূহ পরিলক্ষিত হবে, যা মানুষের যাদুবাজীর দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে না। এ যে খোদার বাণী। এর মধ্যে রয়েছে কি অদ্ভূত শান ও ঐশ্বর্য!! কত গভীরতা ও বিস্ময়কর সত্যতা!!! الا انها قربة لهم سيدخلهم فى رحمته — এর পর এর ফলশ্রুতিতে প্রাপ্য বিষয়বস্তুও বলে দিয়েছেন আল্লাহ্‌তা'লা — "সা-ইউদ্‌খিলুহুম" — নিশ্চয় তাদের উপর রহমতবারি বর্ষিত করবেন। অর্থাৎ পুরস্কার তো তারা পেয়ে গেছে যে, তারা নৈকট্যলাভে ধন্য। তবেই তো এমনতর আচরণ প্রদর্শন করছে। যা তারা আকাঙ্খা করেছিল তা বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু তা ছাড়াও আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন — "সা-ইউদ্‌খিলুহুম ফি রহমাতিহি — আল্লাহ্ তাদেরকে তা ছাড়াও রহমতরাশি দান করবেন, "ইন্নাল্লাহা গাফুরুর রাহীম" —আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু, বার বার রহমকারী।

এখানে سيدخلهم الله فى رحمته এর দ্বারা বুঝায় এই যে, খোদার কৃপা ও করুণা তাদেরকে আবৃত ও আচ্ছাদিত করবে। তারা তার ভেতরে প্রবেশ করে যাবে। তাদের আগে পিছে, ডানে ও বামে, উপরে এবং নীচে রহমত, আর শুধু রহমতই বিরাজ করবে। রহমতের এই সর্বময় পরিমণ্ডল তাদেরকে ছেয়ে ফেলবে, তাদেরকে নিজের মধ্যে জড়িয়ে নিবে এবং তাদের কোন অংশই বারীতা'লার রহমতের বাইরে থাকবে না। "ইন্নাল্লাহা গাফুরুর রাহীম" এর দ্বারা সেই সঙ্গে এই ওয়াদাও প্রদান করলেন যে, খোদাতা'লা অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং দয়াপ্রদর্শনকারী। এখানে এ সম্ভাবনার উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা খোদার পথে মালি কুরবানী করে এবং ঐরূপ প্রীতি ও ভালবাসার ভঙ্গীতে করে, তাদের মধ্যে অনেক সময় আবার অন্যান্য দুর্বলতা থাকে (বা থাকতে পারে), কিন্তু মালী কুরবানীর সুবাদে তাদের নাক-নকশা সুধরিয়ে যায় এবং তারা অত্যন্ত সুন্দর ও অতি উচ্চাঙ্গীন চারিত্রিক ভূমিকা প্রদর্শনকারী হয়ে যায়। কিন্তু কোন কোন অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের দুর্বলতাও সংঘটিত হয়, গাফিলতি ঘটে যায়, কোন কোন সময় গোনাহ্‌ও সংঘটিত হয়ে পড়ে। (তখন) 'ইস্তেগ্‌-

ফারে'র মনোযোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। তার পরও আবার তারা হোঁচট খায়। অতএব, আল্লাহ্‌তা'লা বলেন যে, এহেন লোকদের পক্ষে আমি ঘোষণা করছি যে — ان الله غفور رحيم —"আল্লাহ্‌ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু।" যখন কারো কোন একটি ভঙ্গীমা পসন্দ হয়ে যায় তখন তার অন্য কোন কোন ত্রুটি উপেক্ষা করে, চোখ বুজে নেয়। আর যখন কারো কোন আচরণভঙ্গী খুবই পসন্দ হয়, তখন ততই অধিক মাত্রায় ক্ষমাশীল ব্যক্তির অন্তরে একটা (অদম্য) আকাঙ্খার সৃষ্টি হয়। অতএব, এখানে সেই আকাঙ্খারই উল্লেখ রয়েছে। অন্যথায়, ইতোপূর্বে ক্ষমা চাওয়ার কোন বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়নি। সুতরাং এ কথাটিও আপনারা স্মরণ রাখবেন যে, কোন কোন নেকী বা পুণ্যকাজে অসাধারণ পূর্ণত্ব অর্জন করার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‌তা'লার সত্তার মাগফিরাত (ক্ষমা) প্রদানের আকাঙ্খা বা ভাবপ্রবণতার উদয় ঘটে এবং ক্ষমার আগ্রহ ও বাসনার সৃষ্টি হয়। সুতরাং যেখানে (ক্ষমা প্রার্থনার) হাত প্রসারিতও করা হয় নাই, সেখানেই খোদাতা'লা নিজগুণে উল্লেখ করে দিয়েছেন — "ইন্নাল্লাহা গাফুরুর রাহীম"—যে, তাদেরকে আমরা এটাও জানিয়ে দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং অত্যন্ত দয়ালু। এর পর রয়েছে তৃতীয় আয়াতটি।

والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار

—অগ্রগামী ও অগ্রবর্তী তো তারাই — "মিনাল মুহাজেরীনা ওয়াল আনসারে" — যারা রয়েছেন মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যকার অর্থাৎ মরুবাসী আরবরা তো পরবর্তীকালে এসেছে। তার পূর্বে কারা ছিল? তাঁরা ছিলেন মুহাজির এবং আনসার। যাঁরা হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর কাছে তরবীয়াত লাভ করেন, তাদের কথাই স্বতন্ত্র। কাজেই আল্লাহ্‌ বলেন :—

والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان

—এবং ঐ সকল লোক, যারা 'ইহ্‌সান'-এর সাথে (বা মধ্য দিয়ে) তাদেরকে অনুসরণ করে। رضى الله عنهم و رضوا عنه তাদের তো অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি। উভয়ে উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট। واعد لهم جنات تجرى تحتها الانهار —তাদের জন্যে খোদাতা'লা এরূপ জান্নাতসমূহ সৃষ্টি করেছেন যেগুলোর মধ্যে প্রবহমান রয়েছে নদী-নালা। ذلك الفوز العظيم —এবং ইহা খুবই বড় রকম সফলতা।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, "ওয়াল্লাযীনাত্তাবাউহুম বে-ইহ্‌সানির রাযিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাযু আনহু" — আয়াতাংশে কেবল সাহাবাকেই বুঝায় না। বরং সাহাবাদের উল্লেখ যেহেতু আলাদাভাবে পূর্বেই হয়ে গেছে সেহেতু যথাসম্ভব এখানে আদৌ সাহাবাদেরকে বুঝান হয় নাই বরং সাহেবাদেরকে অনুগমনকারীদের উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা তাদের পরে হবেন। অতএব, সেদিক থেকে আমার মতে এ আয়াতটির বিষয়বস্তু চির প্রবহমান। এ কথা বলা

ভুল যে, এস্থলে কেবল আঁ-হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সময়কালীন লোকদেরই উল্লেখ করা হচ্ছে। যদি 'কালামে ইলাহী' (কুরআন) সর্বকালের জন্য হয়ে থাকে, যদি আঁ-হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দৃষ্টান্ত ও নমুনা এবং তাঁর নিকট তরবীয়ত প্রাপ্ত সাহাবাদের নমুনা চিরদিনের জন্য হয়ে থাকে, তাহ'লে এই ফয়েয ও কল্যাণ যে ব্যক্তিই পাবে, সে উক্ত আয়াতে বর্ণিত পুরস্কারসমূহ থেকে পর্যাপ্ত অংশীদার হবে। কিন্তু একটি শর্ত যুক্ত করে দেয়া হয়েছে—ওয়াল্লাযীনাত্তাবায়ুহুম বে-ইহ্‌সান (অর্থাৎ যারা ইহ্‌সানের সাথে তাদের অনুগমন করেছে। এখন 'ইহ্‌সান' শব্দটি প্রণিধান যোগ্য। এখানে 'ইহ্‌সান' কিরূপে বিষয়বস্তুর সাথে খাপ খায়? আপনারা যখন কারও অনুগমন করেন তখন এর সাধারণ (পরোপকার) অর্থে তো ইহ্‌সান করেন না (অনুগমন করে) তার উপর আমরা কোন ইহ্‌সান করি নাই। তার অনুগমন করেছি। যার অনুগমন করা হয় সে বরং ইহ্‌সানকারী হয়ে থাকে এবং যে অনুগমন করে তার উপর সেই অনুসৃত ব্যক্তির ইহ্‌সান হয়ে থাকে। কাজেই কুরআন করীম যেখানে বাহ্যিক বিষয়বস্তুর পট পরিবর্তন করে, সেখানে সম্ভবতঃ আপনাদের থেমে যাওয়া উচিত এবং জানা উচিত যে, সাধারণ বিষয়াবলী হ'তে স্বতন্ত্র অতি গুরুত্বপূর্ণ কোন কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। বস্তুতঃ আল্লাহ আছেন, যারা এই বুযুর্গদের অর্থাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তরবীয়াত প্রাপ্ত মুহাজেরীন ও আনসারের ভঙ্গীমানুকরণে সচেষ্ট হন, তারাই হলেন "সাবেকুনুল আওয়ালুন", যাঁরা সূচনাকালে ইসলাম ধর্মের শিক্ষালাভ করেছেন এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী আঁ-হুযুর (সাঃ)-এর তরবীয়াত পেয়েছেন। "আওয়ালুন" বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যদিও মরুবাসী আরবদের মধ্যেও ভাল ভাল লোক হয়েছে, কিন্তু তাঁদের তুলনা হতে পারে না যারা প্রারম্ভকালেই আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অনুবর্তিতা করেছেন এবং নিজেরা সরাসরি তরবীয়াত লাভ করেছেন, আর দীর্ঘকাল তরবীয়াত লাভ করেছেন। ঐ সকল লোকদেরকে 'ইহ্‌সানের' সাথে অনুসরণ অনুগমন করার উল্লেখ রয়েছে।

এস্থলে 'ইহ্‌সান'-এর দু'টি অর্থ। ইহ্‌সানের একটি অর্থ তো হলো এই যে, তারা নিজেদের উপরই ইহ্‌সান করে, অন্য কারও উপর নয়। "ওয়াত্তাবাউহুম বে-ইহ্‌সান" অর্থাৎ নিজের অন্তরাত্মাকে আরো সুন্দরতর করার, নিজের জীবন-অস্তিত্বকে পূর্বাপেক্ষা সুশোভিত করার উদ্দেশ্যে তারা তাদের অনুকরণ ও অনুগমন করে। এখানে অনুবর্তিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে তার আত্মার পরিচর্যা ও পরিবেশনের (তরবীয়তের) বিষয়বস্তু স্বজ্ঞানে অবলীলায় চলে আসে। তারা জানে যে, তারা সুন্দর হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁদের মতন হতে প্রয়াস পায়, যেমন কোন সময়ে কোন কোন লোক কোন ক্রিকেটারকে নিজের হিরো স্বরূপ গ্রহণ করে আবার কেউ কোন এক্ট্রেসকে নির্ধারণ করে এবং তাদের পদ্ধতি রপ্ত করতে চেষ্টিত হয়। যদি সে ক্রিকেটর ভাল বলার হয় তাহলে সেই ভঙ্গীতে বল (নিক্ষেপ) করে। যদি ভাল ব্যাট্‌সম্যান হয় তাহলে তার কলা-কৌশল ও ভঙ্গীমায় ব্যাটিং-এর চেষ্টা করে। আর তেমনিভাবে অর্বাচিন মেয়েরা যখন নতুন নতুন বড় হয়ে উঠে তখন কোন কোন এক্ট্রেসকে তাদের লক্ষ্যবস্তু ও কাম্য হিসেবে নির্ধারণ করে এবং তাদেরই অনুকরণ করতে থাকে। আর তেমনি ছেলেরাও করে থাকে। সুতরাং মার্কেটগুলো ঐ ধরণের পোশাক ইত্যাদি দ্বারা ভরে যায় যেগুলিতে কোন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম থাকে যে এই রকম ক'রে পরিধান করতো বা এই ধরণের জিনিস পসন্দ করতো, তাই তোমরা সেইরূপ কর! এমনটি কেন হয়? এজন্যই যে, তারা সেগুলোকে সুন্দর বলে মনে করে যে, তারাও সুন্দর হয়ে যাবে। তাই অনুকরণের মধ্যে "ইহ্‌সান" সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত। 'ইহ্‌সান' শব্দের অর্থ কোন জিনিসকে ভাল করা, সুন্দর করা।

অতএব, "ওয়াত্তাবাউহুম বে-ইহ্‌সান-এর অর্থ হলো তারা তাদের অনুগমন ও অনুকরণকে মডেল স্বরূপ মনে করে, তারা জানে যে, তারা যতই তাদের কাছাকাছি হতে পারবে ততই নিজেরা সুন্দর এবং আকর্ষণীয় হতে থাকবে। তারা গভীর মনোনিবেশে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে যে, কি কি রঙ্গে তাঁরা কুরবানী করেছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন, আর তারপর সেইরূপ রং-ঢংকেই তারা অবলম্বন করে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) প্রায়শঃ তাঁর খোৎবা-গুলিতে সাহাবাদের মালি কুরবানীর বৃত্তান্তসমূহ এমনভাবে বর্ণনা করতেন যে, তা শ্রবণে শৈশব থেকেই মানুষের অন্তরে ঐ প্রকারের কুরবানী করার বাসনা ও স্পৃহা জেগে উঠতো। আজও আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আল্লাহতা'লার ফযলে উক্ত বিষয়টিতে নতুন রং ভরে দিয়েছে। এই বিষয়টিতে অধিকতর চিত্তাকর্ষণের আয়োজন করে চলেছে। কিন্তু মৌলিক রং-ঢং ও পদ্ধতি বদলায় না। সেগুলিতে কখনও পরিবর্তন ঘটে না, যে মৌলিক বিষয়-গুলোর সম্বন্ধে খোদাতা'লা বলে দিয়েছেন যে "রাযিয়াল্লাহু আনহুম ও রাযু আনহু" (আল্লাহ যাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট)। ঐ সকল মৌলিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক যুগে একই থাকে। এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য, যদি তাই না হয়, তাহ'লে কুরআনকেও বদলাতে হবে, তাহ'লে কোন কিতাবই চিরকালের জন্য কামিল বা পরিপূর্ণ হতে পারে না। কিন্তু যেহেতু কুরআন করীম প্রকৃতির ধর্ম, সেজন্য প্রকৃতিসম্মত বিষয়াদিকে বিশদভাবে বর্ণনা করে যেগুলোতে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটতে পারে না। তা হলো, লা তাবদীলা লেখাল্‌কিল্লাহ্‌" সম্পর্কীয় বিষয়। যেহেতু মানবীয় স্বভাবের সাথে সে বিষয়গুলোকে বেধে দেয়া হয়েছে এবং প্রকৃতি ও স্বভাবে পরিবর্তন হয় না কিন্তু সে স্বভাবের বিকাশস্থলসমূহ বদলাতে থাকে, তার প্রকাশ বিভিন্ন রং ও আকার আকৃতিতে হতে থাকে, তাই আমি যখন বলি যে, নতুন রং ভরেছে, আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, তারা (আহ্‌মদীয়া জামাত) নতুন ভঙ্গী ও পদ্ধতিসমূহ গড়ে তুলেছে। সেগুলি মূলতঃ সে একই ভঙ্গী ও পদ্ধতি, যা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবাদের ছিল। "রাযি-য়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাযু আনহু।" কিন্তু সেগুলিতে নিজ নিজ ভঙ্গীমায় নিজের নিজের ব্যক্তিগত অবস্থান অনুযায়ী নতুন ধরণের আবেগ-অনুভূতি ও প্রকাশ ভঙ্গীর অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে এবং একটা ব্যক্তিত্ব ও অনন্যতা সৃষ্টি করেছে। অতএব, আল্লাহ্‌তা'লা যেখানে 'ইহ্‌সানের' উল্লেখ করেছেন সেখানে তার অর্থ এই যে, ঐ মহান ব্যক্তিদের অনুগমন ও অনুকরণ ক'রে নিজেদের আমল ও ব্যবহারিক জীবনকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করে গড়ে তুলতে থাকা।

দ্বিতীয় বিষয়বস্তুটি ঐ সকল লোকের সাথে সম্পৃক্ত যাদের অনুবর্তিতা করা হয়। 'ওয়া-ত্তাবাউহুম বে-ইহ্‌সান"। "ইহ্‌সান"-এর একটি অর্থ হলো 'অতীব সুন্দর নেকী, সর্বাঙ্গ সুন্দর পুণ্য কাজ। কেননা আঁ-হযরত (সাঃ) সবচেয়ে উচ্চ পর্যায়ের নামাযের যে সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন উহাকে "ইহ্‌সান" বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং কুরআন করীম থেকে জানা যায় যে, ইহ্‌সানের এই অর্থ হলো একটি ধর্মীয় পরিভাষা, অর্থাৎ এরূপ নেকী যা নিজ গুণে ও মানে পরিপূর্ণতার মার্গে উপনীত। অতএব, আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন, তারা তাঁদের অনুগমন ও অনুকরণের ক্ষেত্রে তাঁদের দ্বারা কি দুর্বলতা ঘটেছে তা তারা দেখে না। বরং তারা তাঁদেরকে এইরূপে নমুনা বানায় যে, শুধু তাঁদের নেকীসমূহের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে না বরং তাঁদের সর্বোৎকৃষ্ট নেকীগুলিতে তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং তাঁদের মধ্যে যাঁরা সর্বোত্তম ভঙ্গী প্রদর্শনকারী, খোদার মহব্বতে বিলীন, মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর আশেক ও প্রেমিক ছিলেন, তাঁদেরকে অনুসরণ করে, তাঁদের ভঙ্গী ও পদ্ধতিসমূহের মধ্যে যেগুলি সর্বোৎকৃষ্ট ও পূর্ণতার মার্গে উন্নীত সেগুলোর অনুকরণ করে। (ক্রমশঃ)

পবিত্র রমযান ও আমাদের করণীয়

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে কুশলেই আছেন। পবিত্র রমযান দ্বার প্রান্তে। এই মাস ইবাদত বন্দেগীর মাস, বিশেষ করিয়া ইহা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লার ফযল, রহমত ও নৈকট্য লাভের এক বিরাট সুযোগ বহন করিয়া আনে। রমযানের গুরুত্ব সম্বন্ধে কতিপয় হাদীস আপনাদের জ্ঞাতার্থে উদ্ধৃত করা হলো :

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন— যখন রমযান আসে, আকাশের দুয়ারসমূহ উন্মুক্ত হয় এবং জাহান্নামের দুয়ারসমূহ বন্ধ করা হয়। শয়তানদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় (অন্য বর্ণনায়—রহমতের দুয়ার উন্মুক্ত হয়)।

—বুখারী, মুসলিম

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ঈমানের সহিত এবং সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা রাখে, তাহার পূর্ব গুণাহ সকল মাফ হইয়া যায়। যে ঈমানের সহিত এবং সওয়াবের আশায় রমযানে নামায পড়ে তাহার পূর্ব গুণাহসমূহ মাফ হইয়া যায়। যে ঈমানের সহিত এবং সওয়াবের আশায় কদরের রাত্রে নামায পড়ে, তাহার পূর্ব গুণাহ মাফ হইয়া যায়। —বুখারী, মুসলিম

উপরোক্ত রাবী হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক সৎকার্য দশ গুণ হইতে একশত গুণ বৃদ্ধি করা হইবে। মহান আল্লাহ্‌ বলিয়াছেন, রোযা ব্যতীত, কেননা তাহা আমারই জন্য এবং আমিই তাহার ক্ষতিপূরণ দিব। সে আমারই জন্য তাহার প্রবৃত্তি এবং খাদ্য ত্যাগ করে। রোযাদারের জন্য দুইটি আনন্দ — একটি আনন্দ ইফতারের সময় এবং একটি আনন্দ তাহার প্রভুর সহিত সাক্ষাতের সময়। নিশ্চয় রোযাদারের মুখের গন্ধ মেশ্‌কের সুগন্ধি হইতেও আল্লাহ্‌র নিকট অধিক উত্তম। রোযা ঢাল স্বরূপ। যখন তোমাদের কাহারও নিকট রোযার দিন উপস্থিত হয়, সে যেন মন্দ কথা না বলে এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার না করে। যদি তাহাকে কেহ তিরস্কার করে, সে যেন বলে, আমি রোযাদার।

—বুখারী, মুসলিম

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যখন রমযান মাসের প্রথম রাত্রি উপস্থিত হয়, অনিষ্টকর শয়তানদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, এবং দোযখের দরজা বন্ধ করা হয়। সুতরাং ইহার দরজা খোলা হয় না। জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয়, তাহার কোনও দরজা বন্ধ রাখা হয় না। একজন ঘোষণাকারী

ঘোষণা করে, হে মঙ্গল অনুসন্ধানকারী! সামনে আস। হে অনিষ্টের অনুসন্ধানকারী! সংক্ষেপ কর। তাহারা আল্লাহ্‌র জন্য দোযখ হইতে মুক্ত। ইহা প্রত্যেক রাত্রে ঘোষণা করা হয়। —তিরমিযী

হযরত আনাস-বিন মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রমযানের প্রারম্ভে রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, এই মাস তোমাদের নিকট উপস্থিত। ইহাতে এমন এক রাত্রি আছে যাহা এক হাজার মাস হইতেও উত্তম। যাহাকে ইহা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে তাহাকে সর্বপ্রকার মঙ্গল হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে এবং দুর্ভাগ্য লোক ব্যতীত আর কেহই ইহার মঙ্গল হইতে বঞ্চিত হয় না। —মেশকাত

আল্লাহ্‌তা'লার নিকট তাই দোয়া করি তিনি যেন প্রত্যেক ভ্রাতা ও ভগ্নীকে এই পবিত্র মাসে অধিক হইতে অধিকতর কল্যাণ ও বরকত লাভের সুযোগ দান করেন। কুরআন শরীফ ও হাদীসের নির্দেশাবলীর আলোকে এই মাসে অধিক পরিমাণে সদকা ও দান-খয়রাত করা প্রয়োজন। হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর মহান আদর্শ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। তিনি রমযান মাসে ঝড়-তুফানের চেয়েও প্রবল গতিতে সদকা খয়রাত করিতেন।

এই পবিত্র মাসে যাহাতে রীতিমত কুরআন শরীফের দরস দেওয়া হয়, সেইজন্য মুরব্বী ও মোয়াল্লেম সাহেবান যেন তাহাদের নিজ নিজ জামা'তে দরসের ব্যবস্থা করেন। প্রেসিডেন্ট সাহেবান তাহাদেরকে সাহায্য করিবেন। যে জামা'তে কোন মুরব্বী বা মোয়াল্লেম নাই সে জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব স্বয়ং অথবা যে কোন একজন কুরআন জানা ভ্রাতা দ্বারা দরস দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। প্রত্যেকে কমপক্ষে দৈনিক এক পারা করিয়া নাযেরা কুরআন পাঠ করিতে সচেষ্ট হইবেন। এই ব্যাপারে কতটুকু বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহা পত্র দ্বারা অত্র অফিসে খাকসারকে অবহিত করিবেন।

প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ ও স্বগৃহে অবস্থিত ভ্রাতা ও ভগ্নী বিনা ব্যতিক্রমে যাহাতে রোযা রাখেন সেই সম্পর্কে আমীর/প্রেসিডেন্ট/মুরব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবান সযত্নে তদারক করিবেন। গ্রামবাসী যাহারা বার্ধক্য বা শারীরিক অসুস্থতার কারণে রোযা রাখিতে অক্ষম তাহারা জামা'তের ফাণ্ডে কমপক্ষে ৩০০/- টাকা ফিদিয়া জমা দিবেন। এই ফাণ্ডের টাকা প্রয়োজনমত সম্যক বা একাংশ রোযা চলাকালীন সময়ে স্থানীয় গরীব ভ্রাতা ও ভগ্নীদের মধ্যে সাহায্য হিসাবে বন্টন করিবেন। বাকী উদ্বৃত্ত টাকা কেন্দ্রে পাঠাইয়া দিবেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, তেজগাঁও, মোমেনশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও নারায়ণগঞ্জ এর মত শহরে ফিদিয়া হইবে কমপক্ষে ৩৫০/- টাকা। আল্লাহ্‌ যাহাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল করিয়াছেন তাহারা নিজেদের অবস্থানুযায়ী বর্ধিত হারে ফিদিয়া দিবেন। এইসব জামা'তের উদ্বৃত্ত ফিদিয়ার টাকা অত্র দপ্তরে পাঠাইবেন। এবারকার ফিৎরানা মাথা পিছু ২৪/০০ টাকা ধার্য করা হইল। ইহার অর্ধেক ১২/০০ টাকা।

অবস্থানুযায়ী প্রত্যেকের জন্য পুরা বা অর্ধেক হারে ফিৎরানা দেওয়া যাইবে। স্মরণ রাখিবেন, পবিত্র ঈদের দিন নামাযের পূর্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এমন শিশুর জন্যও ফিৎরানা আদায় করিতে হইবে। যে জামা'তে ফিৎরানা গ্রহণ করার লোক নাই, অথবা ফিৎরানা বিতরণের পর টাকা উদ্বৃত্ত থাকে সেই টাকা অত্র দপ্তরে পাঠাইবেন। ইহা ছাড়া আরও একটি উল্লেখ্য বিষয় এই যে, মোট আদায়কৃত ফিৎরানা হইতে শতকরা ১০ ভাগের এক ভাগ অত্র অফিসে অবশ্যই পাঠাইতে হইবে। অনুরূপভাবে যাহাদের যাকাত ফরয তাহারাও এই পবিত্র মাসে যাকাত আদায়ে যত্নবান হইবেন। মনে রাখা দরকার, যাকাত আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয। যাহাদের উপর ইহা ফরয তাহারা ইহা আদায় না করিলে গুনাহ্‌গার হইবেন। রমযান আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের এক মহা সুযোগ আনয়ন করিয়াছে। তাই এই পবিত্র মাসে আমরা যেন বেশী বেশী করিয়া আল্লাহ্‌তা'লার তসবীহ্‌ তাহ্‌মীদ (পবিত্রতা এবং মহিমা) ঘোষণা করি।

সাধারণতঃ রমযান মাস নফল ইবাদত, যিক্‌রে ইলাহী ইত্যাদির এক বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করে। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী নামায তাহাজ্জুদ, তেলাওয়াতে কুরআন, দরূদ শরীফ পাঠ, ইস্তেগফার, মস্‌নুন দোয়া ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য সর্বদা চেষ্টারত থাকিবেন এবং জামা'তের উন্নতির জন্য বেশী বেশী করিয়া দোয়া করিবেন। যেখানে সম্ভব তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ্‌র নামায বা-জামা'তের ব্যবস্থা করিবেন এবং জামা'তের সকল ছেলেমেয়েকে লইয়া নামায পড়িবেন। যেখানে তাহাজ্জুদ নামায বা-জামা'ত পড়া সম্ভব নয় সেখানে অবশ্যই তারাবীহ্‌'র নামায বা-জামা'ত আদায় করিতে সচেষ্ট হইবেন। স্মরণ রাখিবেন, তারাবীহ্‌ নামায পড়ার পরও তাহাজ্জুদের নামায পড়া যায়। মোটকথা রমযান মাসে রাত্রিকে ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে জাগরিত রাখাই আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সুন্নত। এই বছর জামা'ত বড়ই সংকটের সম্মুখীন। সুতরাং অন্যান্য দোয়ার সহিত জামা'তের হেফাযত ও কল্যাণের জন্যও সর্বদা দোয়া জারী রাখিবেন।

রমযান মাসের শেষের ১০ দিনে হযরত রসূল করীম (সাঃ) ই'তেকাফ করিতেন। ইহা বরকতপূর্ণ এবং জরুরী ইবাদত। প্রত্যেক জামা'তে যাতে বন্ধুরা ইহাতে শরীক হন উহার জন্য এখন হইতেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। রমযান মাসে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর কিতাব, যথাঃ কিশ্‌তিয়ে নূহ, ইসলামী নীতি-দর্শন, বারাকাতুদ দোয়া ও সিলসিলার অন্যান্য পুস্তকাদি যথা — আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম, জযবাতুল হক, আল্লাহ্‌তা'লার অস্তিত্ব প্রভৃতি পুস্তকসমূহ বিশেষ মনোযোগ সহকারে নিয়মিত পাঠ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (সাঃ)-এর খুতবা ও খুতবার ক্যাসেটসমূহ যথাসাধ্য শুনিবারও ব্যবস্থা করিবেন।

বন্ধুগণকে ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, রমযানুল মুবারকে বান্দার দোয়া বিশেষভাবে কবুল হয়। তবলীগ ও ইসলাহের ময়দানে জামাতের পূর্ণ কামিয়াবীর জন্য আপনারা ধৈর্য ও

সহনশীলতার সহিত দোয়া করিতে থাকিবেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা তাহার সকল বান্দাকে হেদায়াত দান করেন এবং দুনিয়ার অন্ধকার দূর করিয়া উজ্জল দিনের উদয় করেন। বিশেষ করিয়া এই দোয়া করা উচিত যেন আমরা এই শতাব্দীতে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করিতে পারি। আল্লাহ্‌ যেন আমাদের সবার সংকল্পে দৃঢ়তা দান করেন। পাকিস্তানের আহ্‌মদীগণ ঈমান রক্ষার্থে সেখানে অকাতরে তাহাদের জান মালের কুরবানী দিয়া চলিয়াছেন। কয়েকজন আহ্‌মদী এখনও জেলে বন্দী রহিয়াছেন তাহাদের সর্বময় হেফাযত ও মঙ্গলের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র কাছে এই পবিত্র মাসে বিশেষভাবে দোয়া জারী রখিবেন।

ইহা ব্যতীত আমরা একটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। তাহা হইলে মালী কুরবানী, যাহার জন্য বিশেষভাবে এই পবিত্র রমযান মাসই উপযুক্ত সময়। প্রত্যেক ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট বিশেষভাবে আবেদন জানাইতেছি যে, এই পবিত্র মাসে প্রত্যেকে নিজ নিজ সাধ্যমত আর্থিক কুরবানী দিতে বিশেষতঃ যাকাত, তাহ্‌রীকে জাদীদ ও ওয়াক্‌ফে জাদীদের সম্পূর্ণ চাঁদা ও ভারত-আফ্রিকা ফাণ্ড, ওয়াশিংটন মসজিদ ফাণ্ড, আফ্রিকার কতিপয় দেশের জন্য বিশেষ সদকা ফাণ্ড এবং আমাদের মসজিদ মিশন ফাণ্ডে সাধ্যমত চাঁদা আদায়ে যত্নবান হইবেন। তাহ্‌রীকে জাদীদ এবং ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে রমযান শরীফে পূর্ণ চাঁদা আদায়কারীদের নামের তালিকা বিশেষ দোয়ার জন্য হুযূর আকদাস (আইঃ)-এর খেদমতে পাঠান হইবে।

আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আইঃ)-এর পূর্ণ স্বাস্থ্য, সুদীর্ঘ হায়াত এবং সিলসিলার সকল মুরব্বী, মোয়াল্লেম, সর্ব শ্রেণীর ওহ্‌দাদার ও সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর জন্য এবং বর্তমান শতাব্দীতে ইসলাম তথা আহ্‌মদীয়াতের বিশ্ব-বিজয়ের জন্য, বিশ্ব-শান্তি কায়েমের জন্য ব্যক্তিগত ও ইজতেমায়ীভাবে দোয়া জারী রাখিবেন।

বন্ধুগণ স্মরণ রাখিবেন যে, বর্তমান শতাব্দী ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সুতরাং বন্ধুগণ ঐকান্তিকতার সহিত তবলীগের কাজ করার সাথে সাথে আল্লাহ্‌তা'লায় দরবারে বিশেষভাবে দোয়া করিবেন যেন তিনি অপূর্ব ঐশী সাহায্য ও উজ্জল নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে সেই গৌরবোজ্জল মহান কল্যাণবর্ষী বিজয় ও বিশ্ব-শান্তি আমাদিগকে অচিরে লাভ করার সৌভাগ্য দেন। বিশ্ব-মানব যেন মহামহিমাময় আল্লাহ্‌র গুণ-গানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তোলে এবং হেদায়াতমণ্ডিত সুদিনের হাসি মানুষের মুখে ফুটিয়া উঠে। আমীন! বাংলাদেশ জামা'তের হেফাযত, অগ্রগতি ও সাফল্যের জন্যও বিশেষ দোয়ার আবেদন করিতেছি। আল্লাহ্‌তা'লা সকলের হাফেয ও নাসের হউন। আমীন।

ওয়াস্‌সালাম

খাকসার

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

ন্যাশনাল আমীর

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৬৮তম সালানা জলসায় হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর পয়গাম

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের আমার প্রিয় সদস্যবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

ইহা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, আপনাদের বার্ষিক জলসা কল্যাণমণ্ডিত ঐতিহ্য নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদের সকলকে ঐ সকল কল্যাণ হতে বেশী বেশী অংশ দান করুন। আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ অত্যন্ত চৌকষ ও সাহসী এবং সব ধরণের বিরোধিতার তুফানে খোদাতা'লার উপর নির্ভরশীল জামা'ত। বিরোধিতার প্রেক্ষাপটে খোদাতা'লা স্বীয় সাহায্য ও অদৃশ্যের নিদর্শনও দেখিয়েছেন। প্রত্যেক বিরোধিতার সময় উহা ঈমানকে অত্যধিক দৃঢ়তা দান করেছে। আল্লাহ্‌তা'লা এমনভাবে নসিহত করেছেন যে, প্রজ্ঞা ও সৎ উপদেশ দ্বারা যেন দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজ করা হয় ফলে আমলের মধ্যে যেন ঐশী শক্তির সঞ্চার হয় আর তার প্রভাবে মানবমণ্ডলী আকৃষ্ট হয়। বিভিন্ন সময়ে আমি আপনাদেরকে উপদেশ দিয়েছি এবং বর্তমানে আমার উপদেশ এই যে, দোয়ার মাধ্যমে ঐ সকল উপদেশগুলোর উপর আমল করুন এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে ঐ সমস্ত হেদায়াতের প্রতিটি দিক অবলম্বন করুন এবং দোয়া করুন। আল্লাহ্‌তা'লা এই জলসাকে কল্যাণমণ্ডিত করুন এবং উদ্দীপনার পরিবেশে খোদার হেফাযতে, খোদার স্মরণে এবং রসূল করীম (সাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠের মাধ্যমে এই দিনগুলোকে অতিবাহিত করুন। খোদাতা'লার হেফাযতে আপনারা ঘরে ফিরুন।

আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদের সহায় হউন। ওয়াস্‌সালাম।

খাকসার
মির্যা তাহের আহ্‌মদ
খলীফাতুল মসীহ রাবে'

(৮-২-৯২ তারিখ টেলিফোন মারফত প্রাপ্ত পয়গামের বঙ্গানুবাদ)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৬৮তম সালানা জলসা

(৭-৯ ফেব্রুয়ারী '৯২)

ন্যাশনাল আমীর সাহেবের উদ্বোধনী ভাষণ

আশহাদু আন্‌লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহ্‌, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, আম্মা বায়'দু, ফাআউযুবিল্লাহে মিনাশ্‌ শাইত্বানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন, আর রহমানির রাহীম মালেকে ইয়াউমিদ্দীন, ইয়্যা কানা-বুদু ওয়া ইয়্যা কানাস্‌তায়ীন। ইহ্‌দিনাস্‌ সীরাতাল মুস্তাকীম, সীরাতাল্লাযীনা আন্‌আমতা আলায়হীম, গায়রিল মাগদুবে-আলায়হিম ওয়ালাদ্দাল্লীন।

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

এক বছর পর আল্লাহ্‌র অসীম করুণায় আবার আমরা সালানা জলসায় মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে তাঁরই দরবারে হাজারো শুকরিয়া আদায় করছি। সবাইকে সানন্দ স্বাগতম এবং বাংলাদেশের সব ভাই বোনদের বিশেষ করে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি!

পরিবেশ পরিবর্তন

যে পরিবেশে আজ সমবেত হয়েছি এর তাৎপর্য যত ব্যাপক ও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারবো, সে অনুযায়ী কর্মতৎপর হবো ততই আমরা লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবো। পরিবর্তনকে প্রকৃতির এক স্থায়ী রূপ বা বিধান বলা যায়। জীব ও জড় জগৎ তথা পরিবেশের সর্বত্র এর বিস্তার। জড় জগতের পরিবর্তনে নিজস্ব ইচ্ছা শক্তির প্রক্রিয়া আছে বলে অনুভূত হয় না। জীব জগতে পরিবর্তন দু'ভাবে সাধিত হতে দেখা যায়। কতক পরিবর্তন জীবের ইচ্ছার উপর (যেমন ভ্রূণ হতে জীবন শুরু করে বৃদ্ধ হয়ে মরণ) নির্ভর করে না। তবে জীব জগতে বিশেষ করে স্রষ্টা তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে নিজের চেষ্টায় পরিবর্তন সাধনের যথেষ্ট শক্তি সামর্থ্য ও সুযোগ সুবিধা দান করেছেন (৮ : ৫৪)। এ সবের সঠিক ব্যবহার কল্যাণের এবং অপচয় ও অপব্যবহার অকল্যাণ ও অবক্ষয়ের পথকে প্রশস্ত করে। উল্লেখ্য

যে, এ সবের সুব্যবহারের নির্দেশনা আল্লাহ্ নবী-রসূলগণের মারফত দান করে থাকেন। এও তাঁর এক চিরন্তন বিধান।

এখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে ঘটিত বড় বড় পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করছি। দেশের জনগণ যখন ভোটার বিহীন নির্বাচনের চাপে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ওপর আস্থাহীন হয়ে পড়েছিল তখনই দেশে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলো, হলো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শুভ সূচনা। এই সূচনা যাতে শুভ পরিণতির দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে পারে সে পরিবেশ সৃষ্টিতে সবারই সহযোগিতার হাত বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। নতুবা শুধু আমরাই নই আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মও অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাবে আর হীন স্বার্থান্বেষীরা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়ার স্বেচ্ছায় বিলুপ্তি ঘটানো যাকে 'আত্মহত্যা' বল্লে ইহা বোধ হয় বুঝতে সহজ হবে, সমগ্র বিশ্ব ইতিহাসে ইহা এক অনন্য ঘটনা। পৌনে এক শতাব্দীতে অপরিমিত রক্তক্ষয়, পর্যাপ্ত মেধা ও শ্রম সাধনায় গড়া সুবিশাল দেশ এবং পরাশক্তির মর্যাদায় ভূষিত রাষ্ট্রটি যেভাবে বিনা যুদ্ধে অতি স্বল্প সময়ে নিজেকে মুছে ফেল্লো-তা আমাদেরকে কুরআন পাকের বাণী 'কুন ফায়াকুনকে' স্মরণ করিয়ে দেয়। এ বিলুপ্তি নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে, হচেছ এবং আরো হবে। বরং বলা যায় এনিয়ে আলোচনার কখনও ইতি টানা যাবে না। তবে একটি কথা বোধ হয় বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, আদর্শে বড় রকমের গলদ থাকলে অন্য কিছুতেই তা পূরণ হয় না। আদর্শের দৈন্য নিয়ে ধন্য ও বরেণ্য হওয়া যায় না।

কুরআন ও রসূল করীম (সাঃ)-এর শিক্ষা ও আদর্শভিত্তিক পরিবর্তনের জন্যে এ যামানায় আল্লাহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে (১৮৩৫-১৯০৮) প্রতিশ্রুত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দীরূপে প্রেরণ করেছেন ইসলামকে পুনর্জীবন দান এবং বিশ্বময় পুনর্বাসিত করার উদ্দেশ্যে। তিনি রাশিয়া সম্পর্কে আল্লাহ হতে প্রাপ্ত যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এ পর্যন্ত এর কতকগুলো সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হয়েছে। বাকীগুলো পূর্ণ হতে চলেছে। এ নিয়ে আলোচনা না বাড়ায়ে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব কর্তৃক প্রণীত পুস্তিকা 'রাশিয়ায় কমিউনিজমের সূর্যাস্ত ও ইসলামের সূর্যোদয়' পাঠ করার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি। বড়ই উৎসাহের বিষয় যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) রাশিয়ায় ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য ত্বরিৎ ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছেন এবং তা ফলপ্রসূ হয়ে চলেছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বেলায় প্রত্যক্ষভাবে যে বড় ঘটনাটি ঘটেছে তা হলো কাদিয়ানে সদ্য সমাপ্ত শতবর্ষ পূর্তি সালানা জলসায় ৪৪ বৎসর পর হযরত খলীফাতুল মসীহ (আইঃ)-এর অংশ গ্রহণ। এতে শুধু জামাতেই নতুন

প্রাণ সঞ্চার হয়নি কাদিয়ানও নবজীবন লাভ করেছে। এখন বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ও কাদিয়ান নতুন উৎসাহ উদ্দীপনায় দ্রুত অগ্রগতি সাধন করে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে বিশ্বময় বাস্তবায়ন করে চলবে। উল্লেখ্য যে, এ বৎসর বাংলাদেশ হতে প্রায় পৌনে দুইশত ভাই বোন কাদিয়ানের জলসায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্‌।

এখন স্বদেশ তথা প্রিয় বাংলাদেশের আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কথায় আশা যাক।

বিরোধিতা

সত্যের বিরোধিতা সবদেশে, সর্বকালে হয়ে আসছে। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। হচ্ছেও না। গত কয়েক বছর যাবৎ বিরোধিতার ব্যাপকতা বেড়েছে। তাছাড়া গতানুগতিক ছাড়াও পাকিস্তানী ষ্টাইলে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতকে অমুসলিম ঘোষণা দাবীর উপরে বিশেষ জোর আরোপ করা হচ্ছে। অ-মুসলিম ঘোষণার দাবী যে কত অ-ইসলামিক তা অনুধাবন করার মত উদ্যোক্তারা বুদ্ধি বিবেচনা ব্যয় করছে না। এতে প্রকৃত ও পবিত্র ইসলামকে কত হেয় ও ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে তাও তারা ভেবে দেখছেন না। অযথা অস্থিরতা সৃষ্টি করে তারা দেশের অগ্রগমনেও বিরাট বাঁধা সৃষ্টি করেছেন। অথচ তাদের শক্তি সামর্থ্য গঠনমূলক কাজে ব্যয় করলে ইসলাম ও দেশ উভয়েই প্রভূতভাবে উপকৃত হতো ও সবাই সুন্দর শোভনের সন্ধান পেতো।

ধর্ম অন্তরের এবং আন্তর্জাতিক ব্যাপার। অন্তরের ব্যাপার বলেই এতে জোর জবরদস্তির মোটেও স্থান নেই। ইহা একান্তই প্রত্যেকের মৌলিক অধিকার। এ অধিকারে হাত দেয়া ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের একান্ত পরিপন্থী। বিভিন্ন ধর্মের লোক বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কোন ধর্মের লোক এক দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ, অন্য দেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ। নিজের মতলব হাসিলের জন্য সংখ্যা গরিষ্ঠতার বলে এক দেশে কিছু করলে অন্য দেশও সে নীতি অবলম্বন করবে তা বলা যায় না। এরূপ হতে থাকলে আন্তর্জাতিক শান্তি সোয়াস্ত ব্যাহত হওয়ার সাথে সাথে ধর্মগুলো ও দেশবাসী অজস্র দুর্নামের ভাগী হবে। সংক্ষেপে বলা যায়, যার ধর্ম তার কাছে, এতে সরকারের কি বলার আছে। বস্তুতঃ ধর্ম পালনের হিসাব আল্লাহ্‌ ব্যক্তির কাছ থেকে নিবেন তাতে সরকারের স্থানটা কোথায়? কারো ধর্ম সরকারের নির্দ্ধারণ করে দিবে বা এর জন্য সরকারকে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি হতে হবে কুরআন হাদীস ও সুন্নতে রসূল (সাঃ) থেকে এর অকাট্য প্রমাণ না দিয়ে সরকারকে চাপ দেয়া কখনও ইসলামিক বলে গণ্য হতে পারে কি? বরং কুরআনের শিক্ষা 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন' সরকারের জন্যও প্রযোজ্য।

আমাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে তফসীরে কুরআনের অনুষ্ঠানে 'কাদিয়ানীদেরকে' লক্ষ্য করে এত বেশী অঘন্য লাগামহীন গালিগালাজ করা হয় যে, এতে শ্রোতাদের অনেকেই অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন। এমনই এক অ-আহমদী শ্রোতা ভাই আমাকে বলেছিলেন, কুরআনের

তফসীরে কাদিয়ানীদের গালাগালি ছাড়া আর কিছুই নাই না-কি। কাদিয়ানীরা না থাকলে বুঝি তফসীরই হতোনা। বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করে যা উপলব্ধি করলুম তা হলো তথাকথিত আলেম ও ওলামা ভাইয়েরা কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শ এবং বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সুন্নতের তাৎপর্য ও লক্ষ্য এবং এসবের গভীর ও ব্যাপক মূল্যায়নে অসমর্থ হয়ে ইসলামকে 'মোল্লায়ন' করে ফেলেছেন। অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামকে অবাস্তব কেচ্ছা কাহিনী দ্বারা ঢেকে ফেলা হয়েছে। এই অবাঞ্ছিত মোল্লায়নেরই ব্যাপক অভিব্যক্তি ঘটেছে তাদের আচার আচরণে এবং বক্তৃতা ও তফসীরের মাধ্যমে। অবশ্য সব আলেমকে এই স্তরে ফেলা অন্যায় হবে। তবে মোল্লায়নের পরিধির বাইরে যারা আছেন তাদের সংখ্য তুলনামূলকভাবে খুবই নগণ্য। মিথ্যা অপবাদ দ্বারা বিরোধিতা করা কখনও ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের সহায়ক হতে পারে না। অথচ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরোধিতা করতে গিয়ে তথাকথিত আলেম ওলামারা মিথ্যা প্রচারের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছেন।

এরই অবাঞ্ছিত প্রতিধ্বনি দেখা যায় ১৫/১/৯২ তারিখে 'দৈনিক সিলেটের ডাক' পত্রিকার খবরে। এতে বলা হয়েছে: উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম, আওলাদে রসুল হযরত মাওলানা আসআদ মাদানী কাদিয়ানীদের বিপদগামী বলে আখ্যায়িত করে বলেছেন, 'কাফের সর্দার আবুজাহেল সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)কে সত্য নবী হিসেবে স্বীকার করলেও মুরতাদ গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তা স্বীকার করেনি।' প্রশ্ন হলো এর পরও আবুল হাকামকে আবু জেহেল বলা অন্যায় নয় কি? তার নামের আগে হযরত ও পরে (রাঃ) বলা উচিত নয় কি? ইসলামের ইতিহাসে ইহা নতুন সংযোজন নয় কি? হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)কে হেয় করতে গিয়ে তারা আবু জাহেলের সার্টিফিকেট নিয়েছে। এরপর আর কি বাকী আছে! এতেও তাদের মন কাঁপেনা, তাদের হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভয় জাগে না।

শান্তির ধর্ম ইসলাম। অথচ শান্তিপূর্ণ প্রচারের সব সীমানা লংঘন করে জনসভায় দাঁড়িয়ে আমাদের মসজিদ, আঞ্জুমান এমন কি বাড়ীঘর আক্রমণ ও জবর দখলের উস্কানি ও হুমকি দেয়া হচ্ছে। জানিনা এতে সমাজে ইসলামী আচার আচরণ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কিনা এবং আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট হচ্ছেন কিনা। এ যেন অনেকটা মাস্তানি ধাওয়ার সামিল। আমাদেরকে যতই 'ধাওয়া' করা হউক না কেন প্রতি উত্তরে আমরা তাদের জন্য দরদে দিলে 'দোয়াই' করবো। ধাওয়া ও দোয়ার খেলায় ইনশাল্লাহ আমরাই জয়ী হবো কেন না আল্লাহ্‌ দোয়াকারীদেরই ভালবাসেন যা একটি ঐতিহাসিক সত্য।

আমাদের বিরুদ্ধে যেসব অপবাদ অভিযোগ আনা হচেছ বহুবার এসবের উত্তর দেয়া হয়েছে। ইদানিং আমরা চারটি বুলেটিন প্রকাশ করে আবারও জবাব দিয়েছি। সবাইকে এসব পড়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। এগুলো হলো: (১) বিভ্রান্তির অবসান ও গঠনমূলক কাজে

অবদান অত্যাবশ্যক (২) খতমে নবুওয়তের অস্বীকারকারী কে? (৩) মুসলমান কে? ও (৪) অ-মুসলিম ঘোষণার অ-ইসলামিক দাবী।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আল্লাহ্ কর্তৃক প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দীরূপে প্রেরিত হয়েছেন। শুনা মাত্রই সবাই তা মেনে নিবেন এরূপ আমরা মনে করি না। তাঁর দাবীর বিরোধিতা হবে না তাও নয়। আমাদের আবেদন হলো, যারা ইসলাম বিশ্বাসী বলে দাবী করেন তারা যেন ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের ভিত্তিতে আমাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করেন। আমরা যদি তাদের দৃষ্টিতে অমুসলমান হয়ে থাকি তবে তাদের মহান দায়িত্ব হলো আমাদের কাছে এসে মহব্বতের সাথে ভুল ধরে দেয়া। উল্লেখ্য যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ)-ই তায়েফে গিয়েছিলেন এবং কাফেরদের অত্যাচারে জর্জরিত হওয়ার পরও তাদের জন্য এই বলে দোয়া করেছিলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জাতিকে হেদায়াত দাও, কেননা তারা জানে না তারা কি করছে'। একথা জোর দিয়ে বলতে পারি, তায়েফবাসীরা হুযুর (সাঃ)-এর সাথে যে ব্যবহার করেছিলো আমাদের যিনি মহব্বতের সাথে বুঝাতে আসবেন তার সাথে আমরা কখনও অনুরূপ ব্যবহার করবো না। ইনশাআল্লাহ আমরা পূর্ণ সৌজন্যমূলক আচরণই করবো এবং তার নসিহত অনুধাবন করতে কোনই কার্পণ্য করবো না।

নির্বাচন

প্রতি তিন বৎসর অন্তর আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রেসিডেন্ট, স্থানীয় আমীর এবং ন্যাশনাল তথা জাতীয় আমীরের নির্বাচন হয়ে থাকে। সাথে সাথে নির্বাহী কমিটি অর্থাৎ মজলিসে আমেলার সদস্যদের নির্বাচনও হয়। এবারও এসব স্তরের নির্বাচন এপ্রিলের মধ্যে শেষ করতে হবে। নির্বাচনের জন্য ইতিমধ্যে একটি কমিশন নিয়োগ করা হয়েছে। এই কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নিচ্ছে। এখন এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তবে একটি বিষয়ে বিশ্ববাসীর বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করছি। নির্বাচনের প্রচলিত নিয়ম-পদ্ধতি ও আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের নির্বাচনের প্রধান বৈশিষ্ট্যকে সহজ কথায় বলা যায়—'আমি নেতা' নই 'তুমি নেতা' হও। প্রচলিত নির্বাচনে প্রার্থী হন নিজেরা নেতা দাবী করে। এই নেতৃত্ব কায়েম করার জন্য সত্য মিথ্যার তোয়াক্কা না করে দেদার অর্থ খরচ করে [বরং অপব্যয় বলাই অধিকতর যুক্তিসংগত] প্রার্থী নিজের প্রশংসা ও প্রতিপক্ষের বেশুমার অপবাদ ছড়ায়। এখানেই শেষ নয়। ছলে বলে কৌশলে এমন কি জোর জবরদস্তিতে ভোট আদায় করে গণ (?) প্রতিনিধি হন। এসব নির্বাচনে অনেক খুন খারাবিও হয়ে থাকে। অপরদিকে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের নির্বাচনে কেউ কারো জন্য কোন ইংগিতেও কোন প্রচারণা চালাতে পারে না। তবে নির্বাচনের সময় যিনি যার নাম প্রস্তাব করেন তিনি তার

পরিচিতি দিতে পারেন অন্য কারো সম্পর্কে মন্তব্য না করে। এখানে মাস্তানীর নাম গন্ধও থাকে না। খরচপাতির খাতে থাকে 'নিল' (শূন্য)। ভোটারগণ আল্লাহ্‌কে হাজির নাজির জেনে জামা'তের কর্মকর্তা নির্বাচন করেন। নেতা নিজে দাঁড়াতে পারেন না। যাদের নাম প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হয় তারা নাম প্রত্যাহার করতে পারে না। তৎপর ভোটারগণ প্রত্যক্ষ ভোট দেন। মেজরিটি ভোটের মাধ্যমে তারা বলে দেন—তুমি আমাদের নেতা এবং তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে কার্যকর হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের নির্বাচনে যেমন অযথা কোন 'বচন' নেই, তেমনি নেই আমিত্ব প্রকাশের কোন সুযোগ। এতে দুর্নীতি, দুর্ভাবনা ও দুর্ভোগের দ্বারও থাকে রুদ্ধ। এই নিয়ম পদ্ধতি গ্রহণ করে দুনিয়া অপচয়, অপব্যয় এবং অবক্ষয়রূপ দানবতার হাত হতে মানবতাকে অনেক খানি রক্ষা করতে পারে। সদ্য সমাপ্ত ইউপি নির্বাচনের কথা ভাবুন। ১৫ জনকে হত্যা করা হয়েছে। দুই সহস্রাধিক আহত (অনেকে মারাত্মকভাবে) হয়েছেন। ৬ লাখ টাকা খরচ করে জিততে না পারায় শোকে হার্ট ফেল করে মারা যাওয়ার খবরও আছে। নির্বাচনোত্তর কালেও এ নিয়ে অনেক স্থানে হানাহানি চলছে। স্বামীর মতে ভোট না দেয়ায় স্ত্রীকে তালাক দেয়া হয়েছে।

উপসংহার

আমরা পরিবর্তনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে আলোচনা করে আসছি। বস্তুতঃ সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌ ইসলামের মাধ্যমে 'নূতন দুনিয়া' গড়ার জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'তকে দাঁড় করিয়েছেন। এই মহান উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টায় যতই নিষ্ঠাবান হবো, তাকওয়াকে জীবনে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাবো ততই আমাদের অগ্রযাত্রা ফল-প্রসূ হবে। কোন বাধা বিপত্তিই রুখে দাঁড়াতে পারবে না। অপরদিকে আমাদের আত্মার আচরণ দ্বারা ঐক্যে ফাটল ধরালে, আনুগত্যে শিথিলতা দেখালে, ত্যাগে পিছপা হলে নিজেরাই নিজেদের গতিকে শ্লথ করে ফেলবো এবং আল্লাহরও বিরাগভাজন হবো। তাই এসব বিষয়েও সদা সজাগ থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবার সহায় ও সাথী হউন এই কামনা করে ৬৮তম সালানা জলসার শুভ উদ্বোধনী ঘোষণা করছি।

বিনীত

৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২ মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

কবি ইকবাল ও আহমদীয়াত

আলহাজ্জ আহমদ সেলবর্ষী

কবি এবং দার্শনিক ইকবালকে বলা হয় পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা। তিনি পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলেন কিনা তার প্রমাণ আমি আজো পাইনি। ইকবালের পুত্র জাবেদ ইকবাল 'জিন্দারুদ' নামে তার পিতার তিন খণ্ডে যে জীবনী গ্রন্থ রচনা করেছেন তাতে তিনি লিখেছেন, "পাকিস্তান আমার দাবী নয়" (জিন্দারুদ, ৪২১ পৃঃ)। এই গ্রন্থে এও বলা হয়েছে যে, জিন্নাহ সাহেবের সঙ্গে ইকবালের সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না (৫৭৫ পৃঃ)। তিনি বলতেন, "যে ধর্মকে রাজনীতির আবরণ বানায় সে আমার দৃষ্টিতে লানতি বা অভিশপ্ত" (৬৪৯ পৃঃ)। যাইহোক, তবুও আজ কবি ইকবাল পাকিস্তানের স্বপ্ন দ্রষ্টা এবং ইসলামের একজন পাইওনিয়ার রূপে সর্বজন স্বীকৃত।

কিছু দিন আগে বাংলাদেশের ইকবাল ভক্তদের প্রতিষ্ঠান ইকবাল একাডেমীর একটা সংকলন (ম্যাগাজিন) দেখলাম। এতে জনৈক লিখক লিখেছেন যে, ইকবাল আহমদীদেরকে কাফের জ্ঞান করতেন। তিনি তার বিভিন্ন রচনায় আহমদী জামাতের সমালোচনা করে আহমদীদেরকে অমুসলমান বলেছেন।

ইকবালের নামের সাথে 'আল্লামা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। আল্লামা অর্থ যে জানে। এটি কোন ধর্মীয় খেতাব নয়। যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তির বেলায়ই এই খেতাবটি ব্যবহার করা যায়।

নেহেরুর কাছে লিখিত এক পত্রে ইকবাল লিখেছিলেন যে, ধর্মের প্রতি তার কোন আগ্রহই ছিলনা (নেহেরুর কাছে লিখিত কতিপয় পুরাতন পত্র ২৯৩ পৃঃ) ইকবাল নামাযের পাবন্দ ছিলেন না (ইকবাল, নজীর নিয়াজ কৃত, ১৭১ পৃঃ)। ইকবাল নিয়মিত মসজিদে যেতেন না, কেবল দুই ঈদে মসজিদে যেতেন (জিন্দারুদ, জাবেদ ইকবাল রচিত, ২য় খণ্ড, ১২২ পৃঃ) রোযা কখন কখন রাখতেন (ঐ)। ইকবাল সাধারণতঃ গান বাজানা নিয়ে থাকতেন (মালফুযাতে ইকবাল, ৯৪ পৃঃ)। ইকবাল বিলাতে থাকা কালে পান শালাতে যেতেন এবং বাজে মেয়েদের সাথে মিশতেন (জিন্দারুদ, ২য় খণ্ড ১৭৪ পৃঃ)। ইকবালের পসন্দ ঘরে বসে হুক্কা টানা (ঐ ৪১১ পৃঃ)। কবির পুত্র বলেছেন যে, কখন কখন কবি বলতে বলতে খোদার সম্বন্ধেও বেয়াদবী করে বসতেন (ঐ, ৬৬৬ পৃঃ)।

ইকবাল ছিলেন ইংরাজ সরকারের ভক্ত। তার পরিচয় ছিল 'ইংরাজ বন্ধু' রূপে (ঐ ৩৯৮ পৃঃ)। ইকবাল তার রাজ ভক্তির জন্য নাইট' খেতাব প্রাপ্ত হন (পাঞ্জাব গেজেট, ১৯ই জানুয়ারী, ১৯২৩)। তিনি কখনও এই 'স্যার খেতাব পরিত্যাগ করেন নি। তিনি মহারাণী ভিক্টোরীয়াকে 'খোদার ছায়া' বলেছেন। ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর কবি এক কবিতায় (মর্সিয়া)

দুঃখ করে বলেছেন,—

আয়হিন্দ তেরে সের সে উঠা ছায়ে খোদা

... ...

কাল ঈদ থি তো আজ মুহররম ভি আ গিয়া।

অর্থাৎ হে ভারত, তার মাথা থেকে খোদার ছায়া সরে গেল। কাল ঈদ ছিল কিন্তু আজ মুহররম (মাতমের দিন) এসে গেল। সরকার নিজ খরচে এই কবিতাটি ইংরাজীতে অনুবাদ করে Tears of Blood নামে প্রকাশ করে। অবশ্য লেনিনের উপরও ইকবাল একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছিলেন। আসলে কবিরা ভাবের আবেগে কথা বলেন। এ কথা পবিত্র কুরআন স্বীকার করে (সূরা শূয়ারা দ্রষ্টব্য)।

ইদানিং তারকার নামে (যে নামের এক অর্থ লম্পট) কথিত এক সাংবাদিক একটি বই লিখেছেন। বইটিতে আল্লামা ইকবালকে তিনি সনদ হিসাবে পেশ করে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে ইকবালের কিছু কথা প্রারম্ভেই যুক্ত করে দিয়েছেন। অথচ তিনি জানেন না যে, ইকবাল ধর্ম সম্বন্ধে কত অল্প জানতেন। উল্লেখ্য যে, এই সাংবাদিক লেখকও এককালে কুরআনের সূরার নাম পর্যন্ত জানতেন না (তার লিখিত পোষ্ট এডিটরিয়েল দ্রষ্টব্য)।

যাইহোক, মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে তার (ইকবালের) অভিমত ছিল,—

জিস তরাহ আহমদ মোখতার হ্যায় নবীওমে ইমাম, উসকি উম্মত ভি হ্যায় দুনিয়ামে ইমাম আকওয়াম। কিয়া তুমহারা ভি নবী হ্যায় অহি আকায়ে আনাম, তুম মুসলমান হো তোমহারা ভি অহি হ্যায় ইসলাম? উসকি উম্মত কি আলামত তো কোই তুম মে নেহি। মে জু ইসলাম কি হোতি হ্যায় ও ইস খমমে নেহি। —যেভাবে আহমদ (সাঃ) নবীদের নেতা ছিলেন, তেমনি তাঁর উম্মতও দুনিয়ার জাতিসমূহের সর্দার। কি তোমাদের নবীওকি এই সৃষ্টির মহান (আকা) পুরুষ, তোমরা কি মুসলমান, তোমাদের ধর্ম কি ইসলাম? তাঁর উম্মতের কোন চিহ্নই তো তোমাদের মাঝে নেই, ইসলামের যে জীবনী রস তা তো তোমাদের মাঝে নেই?

শোর হ্যায় হোগায়ে দুনিয়াসে মুসলমান নাবুদ, হাম ইয়ে কহতে হ্যায় কে থে ভি কাহি মুসলেম মৌজুদ? ওজামে তুমহো নাসারা তো তমদ্দুনমে হনুদ, ইয়ে মুসলমাঁ হ্যায় জিনছে দেখকে শরমায়ে ইয়াহুদ। (জওয়াবে শেকওয়া)

—কলরব উঠেছে, পৃথিবী থেকে নাকি মুসলমান নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করি, মুসলমান কি কোথায়ও ছিল? দেখতে তোমরা খৃষ্টান, প্রকৃতিগতভাবে তোমরা হিন্দু (দেখতে ইকবালের চেহারাও খৃষ্টানদের মতই ছিল) এই কি সেই মুসলমান যাকে দেখে ইহুদী লজ্জা পায়? ইকবাল বলেছেন, অধিকাংশ পেশাদার মোল্লা, ইসলামী আমলে অবিশ্বাসী, এরা শরীয়ত থেকে দূরে এবং বস্তুবাদী নাস্তিক ওরা (ইকবাল আওর মোল্লা, ১৩পৃঃ)। মহানবী (সাঃ) বলেছিলেন, মুসলমান ইহুদীর মত হয়ে যাবে আর উলামারা আকাশের

নীচে নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হবে (সহী হাদীস)। ইকবাল বলেছেন, ইহুদীর মত নয় বরং এহেন মুসলমান দেখে ইহুদীও লজ্জা পায়। আর আলেমদেরকে নাস্তিক বলেছেন।

ইকবালের কলমে মুসলমান, মোল্লা মৌলবী এবং স্বয়ং ইকবালের চিত্র আমরা দেখলাম। অথচ এককালে এই ইকবালের বক্তব্য ছিল, "বর্তমান ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী সব চাইতে বড় ধর্মীয় চিন্তাবিদ (ইণ্ডিয়ান এন্টি কোয়েরী, সেপ্টেম্বর ১৯০৩, ভলিয়ম—২৯, পৃঃ ২৩৯)। তিনি আরো বলেছেন, "পাঞ্জাবে ইসলামী আদর্শের সঠিক নমুনা এই ভাবে প্রকাশ হয়েছে, যাকে কাদিয়ানী সম্প্রদায় বলা হয়ে থাকে (মিল্লতে বেয়জা পর এক উমরানী নজর)। তিনি বলেন, ইসলাম প্রচারের আগ্রহ যা তাঁর (মির্যা সাহেবের) জামা'তের অধিকাংশ সদস্যের মধ্যে পাওয়া যায় তা প্রশংসনীয় (ইকবালের পত্রাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পত্র নং—২৩২)।

যে ইকবাল সাধারণ মুসলমান এবং মোল্লা মৌলবী সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ সেই ইকবালের মুখে আহ্‌মদী জামা'ত এবং আহ্‌মদীদের এত স্তুতি বাক্য কেন ?

ইকবালের জন্ম ৯ই নভেম্বর, ১৮৭৭ সালে শিয়াল কোটে। তার পিতার নাম শেখ নূর মোহাম্মদ উরফে নাথু। ইনি আহ্‌মদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন (মযলুম ইকবাল, ১৮৫ পৃঃ) ইকবালের বড় ভাই শেখ আতা মোহাম্মদও (জন্ম ১৮৫৯) আহ্‌মদীয়াত কবুল করেছিলেন (ঐ, ১৮৭ পৃঃ ও যিকরে ইকবাল, ৯ ও ১০ পৃঃ)। ইকবালও ছাত্র জীবনে কাদিয়ানে গিয়ে বয়াত করে ছিলেন (ইকবাল আওর আহ্‌মদীয়াত, ১৩ পৃঃ)। ইকবালের বড় ভাইয়ের ছেলে শেখ এজায আহমদও (জন্ম ১৮৯৯) ১৯৩১ সালে আহ্‌মদী জামা'তে দাখিল হন। তিনি আজো জীবিত আছেন এবং জামা'তের সাথে যুক্ত থেকে ইসলামের সেবা করে যাচ্ছেন। ১৯১১ সালে ইকবাল তার পুত্র শেখ আফতাব আহমদকে লেখা পড়া করার জন্য কাদিয়ানে প্রেরণ করেন। আফতাব আহমদ ছয় বৎসর কাদিয়ানে থেকে ধর্মীয় পরিবেশে লেখা পড়া করেন (জিন্দারুদ, ৫৭৬ পৃঃ)। উল্লেখ্য যে, ইকবালের বড় ভাই শেখ আতা মোহাম্মদই ইকবালকে বিলাত পাঠিয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করেন। ইকবাল তার ভাতিজা শেখ এজায আহমদকে (আহ্‌মদী) অত্যন্ত নেক ও সালেহ বলে উল্লেখ করেছেন (ইকবাল নামা, ৩৮৬ পৃঃ)। তিনি এজায আহমদকে তার সন্তানদের অভিভাবক নিয়োগ করেন (মিসেস ডুরস কৃত—Iqbal As I knew him, ৩৫ পৃঃ)। কবি ইকবালের তিন স্ত্রী ছিলেন। একবার তিনি তার এক স্ত্রীকে সন্দেহজনকভাবে তালাক দেন। এই তালাকের সঠিক ফতওয়ার জন্য তিনি কাদিয়ানে মৌলানা নূরুদ্দীনের (রাঃ) কাছে লোক পাঠান (যিকরে ইকবাল, ৭০ পৃঃ)। উল্লেখ্য যে, মৌলানা নূরুদ্দীন (রাঃ) প্রথম খলীফাতুল মসীহ ছিলেন।

ভারতে অনেক প্রখ্যাত আলেম থাকতে তিনি ফতওয়ার জন্য কাদিয়ানের দিকে মুখ করলেন। বড় বড় শহরে ভাল ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকতে তিনি ছেলেকে লেখা পড়ার জন্য কাদি-

য়ানে প্রেরণ করেন। কেন? কাদিয়ানের প্রতি ইকবালের এই আসক্তি কেন? তার একমাত্র উত্তর হল, ইকবালের মতে ইসলামের প্রকৃত রূপ একমাত্র আহ্‌মদী জামাতেই দেখতে পাওয়া যায়। আর এইরূপ দর্শন করেই ইকবালের পিতা, ভ্রাতা, ভাতিজা এবং তিনি স্বয়ং আহ-মদী জামা'তে দাখিল হয়েছিলেন। ইকবাল একবার লণ্ডন মসজিদে নও মুসলিমদের সমাবেশে ভাষণও দিয়েছিলেন (দৈনিক ইনকিলাব (উর্দু): ২৯শে অক্টোবর, ১৯৩১)। উল্লেখ্য যে, লণ্ডনের এই মসজিদটি শুধু আহমদী মহিলাদের চাঁদায়ই নির্মিত হয়েছিল। এই মসজিদই লণ্ডনের বুকে সর্ব প্রথম খোদার ঘর। এখান থেকেই উচ্চারিত হয় তৌহীদের মর্মবাণী আযান ধ্বনি। বেলাল নাটসেল নামে এক ইংরাজ নও মুসলিম (আহমদী) এই মসজিদে দাঁড়িয়েই (প্রথম ইংরাজ সন্তান) আযান দিয়ে ছিলেন। আল্লামা আহমদী-য়াতের শিক্ষার প্রভাবে বিশ্বাস করতেন যে, সাধারণ মুসলমানদের বিশ্বাস ঈসা (আঃ) আবার আকাশ থেকে নাযিল হবেন, ইহা নও মুসলিম খৃষ্টানদের দ্বারা ইসলামে চালু হয়ে গেছে (মালফুযাতে ইকবাল, ৭০ নুঃ)। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ইয়া'জুজ ও মাজুজের আবির্ভাব বলতে ইউরোপীয় রেনেসাঁ বুঝায়।

খোল গায়ে ইয়াজুজ আওর মাজুজকে লস্কর তামাম
চশ্‌মে মুসলেম দেখলে তফসীর হরফে ইয়ানসেলুন।

তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কাশ্মীরের অধিবাসীরা মূলতঃ বনী ইসরাঈল (আদবী দুনিয়া, ২০৯ পৃঃ, ইকবাল নম্বর)। তিনি এক নূতন মসীহের আগমনে বিশ্বাস করতেন। We need prophets as well as teachers perhaps we want a new christ (Thoughts and Reflections of Iqbal, p—5)।

পরবর্তী কালে এই ইকবাল কেন আহমদী জামা'ত থেকে দূরে সরে গিয়াছিলেন? এর কারণ একাধিক। তিনি অল ইণ্ডিয়া কাশ্মীর কমিটির সভাপতি রূপে আহমদী জামা'তের দ্বিতীয় খলীফার নাম প্রস্তাব করে ছিলেন। কিন্তু পরে আহরারদের সমালোচনার মুখে তিনি তার সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন এবং নিজেই ঐ পদের প্রার্থী হয়ে যান। ক্ষমতার উচ্চাসনে তিনি কখনও চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খানকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারেননি। এটিও তার অন্তরে জ্বালার সৃষ্টি করে। আহরারদের প্রচারণার ফলেও ইকবাল আহমদী জামাতের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেন (আল্লামা নিয়াজ ফতেপুরী, মাসিক নিগার, সেপ্টেম্বর ১৯৬১)।

এখানে এও আলোচ্য বিষয় যে, কবিরা সাধারণতঃ কোন গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চান না। তারা মুক্ত বিহঙ্গের মত উড়ে বেড়াতে চান তাদের ভাবের আকাশে। কোরআনের ভাষায়—আলাম তারা আন্নাহুম ফি কুল্লে ওয়াদিই ইয়াহিমুন, ওয়া আন্নাহুম ইয়াকুলুনা মা লা ইয়াফআলুন—অর্থাৎ কবিরা ভাবের উপত্যাকায় উদ্দেশবিহীন ভাবে বিচরণ করে থাকেন।

তারা যা বলেন তা নিজেরা পালন করেন না। 'মসজিদেরই ঝাড়ু বরদার হয় যেন মোর হাত,' 'খোদার প্রেমে শরাব নিয়ে বেহুশ হয়ে রই ঘরে,' ইত্যাদি কথার সঙ্গে কবির জীবনের মিল নাও থাকতে পারে। কারণ কবি বলেন, 'আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা।' বিশ্ব কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ছিলেন জন্মগত ভাবে ব্রাহ্ম। হিন্দুদের মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে তিনি কবিতা লিখেছেন। ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক হিসাবে তিনি পৌত্তলিকতার সমালোচনা করেছেন। তর্ক হয়েছে বঙ্কিম চন্দ্রের সঙ্গে (বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য)। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বলেছেন, "ঠিক যাকে সাধারণতঃ ধর্ম বলে সে যে আমি আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ় রূপে লাভ করতে পেরেছি তা বলতে পারিনে (ছিন্ন পত্রাবলী, রচনাবলী, ২৪৯ পৃঃ)। এই হল কবিদের রূপ। আর তাই কবি নজরুল ইসলাম মোল্লা পরিবারে জন্ম নিয়েও তিনি ছিলেন 'বন্ধন হারা।' তিনি বলেছেন, আমি মানিনাক কোন আইন" "আমি অনিয়ম উশৃঙ্খল।" হ্যা, এটাই তো কবিদের স্বভাব। রবীন্দ্র নাথ ব্রাহ্ম ধর্মের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার সন্তান হয়েও শেষ কাল পর্যন্ত ঐ গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে পারলেন না। এনিয়ে তার পিতার সাথেও মত পার্থক্য হয়েছে। কবি ইকবালও এই রীতির বাইরে নন। বাল্য কালে আহমদী জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার পক্ষে কবিতা লিখলেও, সাদউল্লাকে মেথরদের মহফিলে বসালেও (এই সাদউল্লা মসীহে মওউদ (আঃ) কে গালি গালাজ করেছিল) শেষ পর্যন্ত তিনি আর এই বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেন না। তিনি বন্ধন ছিন্ন করে চলে গেলেন কবিদের চিহ্নিত আসরে। যেখানে বসে তিনি প্রাণভরে কবিতা লিখলেন। কথা বললেন নিজের ইচ্ছামত। অগণিত মানুষের প্রশংসা পেলেন, হাতের তালি পেলেন অজস্রবার। ভক্তদের কাছে হয়ে দাঁড়ালেন ধর্মের অথরিটি।

তবে হ্যা, কবি নজরুল, বিশ্ব কবি রবীন্দ্র নাথ এবং শায়েরে মাশরেক আল্লামা ইকবাল কাব্য জগতের এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। এরা প্রত্যেকেই কবি হিসাবে স্ব স্ব মহিমায় ভাস্বর। তাদের ব্যক্তিগত জীবন আমাদের আদর্শ নয়, তবে তাদের কবিতা আমাদেরকে প্রেরণা আর আনন্দ দেয়।

ভ্রম সংশোধন

তারিখ	সংখ্যা	পৃষ্ঠা	লাইন	সংশোধনী
১৫-২-৯২	১৪ ও ১৫	৬৫	৫	মৌঃ নিজানুর রহমান ও মৌঃ তৌহীদুল ইসলামের নামও বক্তা হিসেবে যুক্ত হবে।
"	"	৬৮	২৬	'পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল'-এর পরিবর্তে 'সহকারী পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল' পড়তে হবে।

সংবাদ

ওয়াকফে আরযী

যে সব ভ্রাতা রেকাবীবাজার জামাতে (মুন্সীগঞ্জ) ওয়াকফে আরযী করতে ইচ্ছুক তাদেরকে সত্বর খাকসারের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ

এর

৬৮ তম সালানা জলসা—১৯৯২

"আল্লাহতা'লার ফযলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ অত্যন্ত চৌকষ ও সাহসী এবং সব ধরণের বিরোধিতার তুফানে খোদাতা'লার উপর নির্ভরশীল জামা'ত।"

—হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

"ধর্ম অন্তরের এবং আন্তর্জাতিক ব্যাপার। অন্তরের ব্যাপার বলেই এতে জোর জবরদস্তির মোটেও স্থান নেই। এ অধিকারে হাত দেয়া ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের একান্ত পরিপন্থী।...।...সর্বশক্তিমান আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে নূতন দুনিয়া গড়ার জন্য আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তকে দাঁড় করিয়েছেন।"

—মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর

আল্লাহ্তা'লার অপার অনুগ্রহ ও সাহায্যের মাধ্যমে ৭ই ফেব্রুয়ারী,-১৯৯২ থেকে তিনদিনব্যাপী, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৬৮তম সালানা জলসা '৯২ (বার্ষিক সম্মেলন) ঢাকাস্থ দারুত তবলীগ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ২৫৮ জন অ-আহমদী বন্ধুসহ প্রায় আড়াই সহস্রাধিক সদস/সদস্যা যোগদান করেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুয়া ২·৩০ মিনিটে এ রূহানী জলসার উদ্বোধন করতে গিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী তাঁর লিখিত ভাষণে আল্লাহতা'লার শোকরিয়া আদায় করে বলেন, "সত্যের বিরোধিতা সবদেশে, সর্বকালে হয়ে আসছে। বাংলাদেশে এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। হচ্ছেও না। গত কয়েক বছর যাবৎ বিরোধিতার ব্যাপকতা বেড়েছে। তাছাড়া, গতানুগতিক ছাড়াও 'পাকিস্তানী ষ্টাইলে' আহমদীদেরকে অমুসলিম ঘোষণার দাবীর উপরে

বিশেষ জোর আরোপ করা হচ্ছে। অমুসলিম ঘোষণার দাবী যে কত অ-ইসলামিক তা অনুধাবন করার মত উদ্যোক্তারা বুদ্ধি বিবেচনা ব্যয় করছে না।.....

ধর্ম অন্তরের এবং আন্তর্জাতিক ব্যাপার। অন্তরের ব্যাপার বলেই এতে জোর জবরদস্তির মোটেও স্থান নেই।..... এ অধিকারে হাত দেয়া ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের একান্ত পরিপন্থী।"

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। শুরুতে কুরআন করীম থেকে তেলাওয়াত করেন মৌলানা আবদুল আযীয সাদেক। অতঃপর স্বাগত ভাষণ দান করেন ৬৮ তম জলসা ব্যবস্থাপনা কমিটি-৯২ এর চেয়ারম্যান মোহতরম জনাব ভিজির আলী। এ সময়ে বাইরে রাস্তা থেকে বিরুদ্ধবাদীগণ জলসা প্রাঙ্গনের প্যাণ্ডেলের উপর ইট পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। ত্রাস সৃষ্টি করে জলসা পণ্ড করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। পিনপতন নীরবতা ও দোয়ার মাধ্যমে শুরু হয় জলসার কাজ। নযম পড়ে শোনান সৈয়দ সোহেল আহমদ। এ অধিবেশনে 'পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে বর্তমান যুগ,' 'শান্তির একমাত্র পথ ইসলাম' এবং 'আহমদীয়াতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত' এ তিনটি বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, জনাব মকবুল আহমদ খান ও এডভোকেট মুজিবুর রহমান বাংগালী। অধিবেশনের সমাপ্তি হয় বিকেল সাড়ে পাঁচটায়।

পরদিন ৮ই ফেব্রুয়ারী, '৯২ রোজ শনিবার সকাল দশটায় এডভোকেট আলহাজ্জ মির্যা আবদুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে জলসার ২য় অধিবেশনের কাজ শুরু হয়। এ অধিবেশনে কুরআন করীম থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন ও নযম পাঠ করে শোনান জনাব নাসের আহমদ। 'আহমদী মায়েদের কর্তব্য ও দায়িত্ব' 'ইসলামে নারীর মর্যাদা' এবং ইসলামী পর্দা'—এ তিনটি বিষয়ের উপর ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, আলহাজ্জ তবারক আলী ও অধিবেশনের সভাপতি এডভোকেট আলহাজ্জ মির্যা আবদুল হক সাহেব যথক্রমে বক্তব্য পেশ করেন। সবগুলো বক্তৃতাই টেলিভিশন সেটের মাধ্যমে জলসা গাহের বাইরে ও লাজনাদের (মহিলা) কাছে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। এ কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন জনাব মোহাম্মদ নূরুল হক ও তার সাব-কমিটির সদস্যরা।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রামের আমীর মোহতারম নূরুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে বিকাল আড়াইটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে কুরআন করীম থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেয মুহাম্মদ সেকান্দার আলী, নযম পেশ করেন জনাব কাওসার আহমদ। হযরত আমীরুল মোমেনীন খালীফাতুল মসীহ রাবে' (আই) এর পয়গাম পাঠ করে শোনান জলসা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান মোহতরম ন, ন, ম, সালেক সাহেব। পয়গামের এক অংশে হুযুর (আইঃ) বলেন, "আল্লাহতা'লার ফযলে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ অত্যন্ত চৌকষ ও সাহসী এবং সব ধরণের বিরোধিতার তুফানে খোদাতা'লার উপর নির্ভরশীল জামা'ত।" হুযুর (আইঃ)-এর পয়গাম এ সংখ্যার

২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। অতঃপর হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ (পরমত সহিষ্ণুতার আলোকে) সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মৌলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী, 'আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তির খণ্ডন' করেন মৌলানা সালেহ আহমদ এবং এ অধিবেশনে 'নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা' (New World Order) সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট মুজিবুর রহমান বাঙ্গালী। তাছাড়া এ অধিবেশনে বিদেশের জামা'তগুলো থেকে (এ জলসায় প্রেরিত) প্রাপ্ত পয়গামসমূহ পাঠ করে শোনান জনাব কায়সার আলম এবং আরও একটি নযম পেশ করেন মোয়াল্লেম জনাব আবদুল হক।

সন্ধ্যায় (বাদ মাগরিব) জলসাগাহে অনুষ্ঠিত হয় মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার বিশেষ সভা এবং আমীর/প্রেসিডেন্ট সম্মেলন। এডভোকেট মোহতরম মির্যা আবদুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে মসজিদে মজলিসে মুসীয়ানের এক সাধারণ সভায় আগামী তিন বছরের জন্য মজলিসে মুসীয়ান, বাংলাদেশের সদর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

পরদিন ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ রোজ রবিবার ভোর আটটায় পূর্ববর্তী রাতের আমীর/প্রেসিডেন্ট সম্মেলনের মুলতবী সভা মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল নয়টায় (৯-২-৯২) আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকার আমীর মোহতরম মীর মোবাশ্বের আলীর সভাপতিত্বে জলসার চতুর্থ অধিবেশন শুরু হয়। এতে কুরআন করীম থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেয আবুল খায়ের ও নযম পেশ করেন জনাব মোহাম্মদ নূরুল হক। 'শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)' 'ইসলামের খেদমতে হযরত মসীহ (আঃ)' ও 'খেলাফতের কল্যাণ'—এ তিনটি বিষয়ের উপর যথাক্রমে বক্তব্য পেশ করেন মৌলানা বশীরুর রহমান, মৌলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী ও অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান।

যোহর ও আসর নামায জমা (একত্রে) আদায় ও দুপুরের খাবার শেষে বিকাল আড়াইটায় নায়েব ন্যাশনাল আমীর—১ম মোহতরম আলহাজ্জ ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরীর সভাপতিত্বে জলসার সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়।

এ অধিবেশনে কুরআন করীম থেকে তেলাওয়াত করেন মৌঃ মাহমুদ আহমদ শরীফ এবং নযম পেশ করেন মৌলানা সালেহ আহমদ। এতে 'শততম সালানা জলসা ও আহ্‌মদীয়াতের সত্যতা' এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মোহতরম আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী ও 'খাতামান্নাবীঈন এর প্রকৃত তাৎপর্য' ব্যাখ্যা করেন মোহতরম এডভোকেট মুজিবুর রহমান বাঙ্গালী। অতঃপর ৬৮তম সালানা জলসা ব্যবস্থাপনা কমিটি—৯২ এর সেক্রেটারী হিসেবে খাকসার শোকরিয়া জ্ঞাপন করি।

জলসার সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব। তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্যে বিগত বছরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন।

এবারের সালানা জলসার অধিবেশন পরিচালনায় ব্যতিক্রম করা হয়। এবারে কোন উপস্থাপক রাখা হয়নি। অধিবেশনের সভাপতি নিজেই এ কাজটি করেছেন। তাছাড়া প্রত্যেক দিন মাগরিবের নামাযের আগে দোয়ার আবেদনগুলো পাঠ করে শুনিয়েছেন মৌঃ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যগণ সতিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে আমাদের অনুষ্ঠান পরিচালনায় সহায়তা করেছেন। নিরাপত্তার দায়িত্বে আমাদের চৌকষ নির্ভীক খোদ্দাম ভাইদের খেদমতও ছিল অবিস্মরণীয়। ভেকোরেশন/একোমোডেশনের আহ্বায়ক জনাব নূর-এ-এলাহী, মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী, পাকশালার আহবায়ক জনাব মোহাম্মদ শামসুল হক দিনরাত খেটে যেভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন তা অন্যান্যদের জন্য অনুকরণীয় ছিল। দৈহিক ও মানসিক ও আর্থিক কুরবানী করে অন্যান্য যারা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর মেহমানদের খেদমত করেছেন ও জলসা কামিয়াব করেছেন তাদের সকলকে উত্তম কল্যাণে ভূষিত করুন। আমীন! এবারের জলসায় ১৬ (ষোল) জন ভ্রাতা বয়াত করে আহ্‌মদী সিলসিলায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। ৭ (সাত) টি বিয়েও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ জলসায় জনাব এ-বি-আবদুল হামিদ সাহেবের তিন ছেলে ও মেয়ের (আহমদ মোহাম্মদ আলী, আফরোজা শিল্পি, সারিয়া শীলা), জনাব ওবায়দুর রহমান ভুঞা সাহেবের ছেলে মেয়েদের, বেগম রোকেয়া যাহিদ সাহেবার ছেলে মেয়েদের, জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন সাহেবের মেয়ের, জনাব আখতার খাদেম সাহেবের মেয়ে মায়ীশা তাহসীনের এবং কবীর হোসেন পাটোয়ারী, সৈয়দ সালাহউদ্দিন মাহমুদ তারেক এবং সৈয়দ মহিউদ্দিন আহমদ যুবায়ের এর আকিকা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লা তাদের সকলকে সত্যিকার ইসলামের সেবক, সেবিকা করুন। আমীন!

প্রায় দশটি দৈনিকে আমাদের সালানা জলসার সংবাদ ছাপা হয়।

আল্লাহ্‌তা'লা এ জলসার প্রথম দিনে আসমান ও যমীনে উভয় ক্ষেত্রেই যে ঐশী নিদর্শন দেখিয়েছেন তার শোকরিয়া আদায় করে দেশ ও জাতি এবং আহ্‌মদীয়াতের বিজয়ের জন্য দোয়ার মাধ্যমে জলসার কাজ শেষ হয়।

প্রস্তুনায় : এ, কে, রেজাউল করীম
সেক্রেটারী
৬৮তম সালানা জলসা ব্যবস্থাপনা কমিটি—৯২

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামের ২য় সালানা জলসা '৯২ সাফল্যজনক ভাবে সমাপ্ত

পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম মোতাবেক আমাদের জলসা সালানা '৯২ বিগত ১৪ ও ১৫ই ফেব্রুয়ারী রোজ শুক্র ও শনিবার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। আলহামদুলিল্লাহ।

শুক্রবার জুমুআর নামাযের পর প্রথম অধিবেশন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর নযম পাঠের সাথে শুরু হয়। শনিবারে দুইটি অধিবেশন হয়। জলসায় প্রথম ও তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব নূরুদ্দীন আহমদ, আমীর, চট্টগ্রাম জামাত। মোহতারম এডভোকেট মির্যা আবদুল হক সাহেব, আমীর পাঞ্জাব এবং মোহতরম এডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেব, আমীর রাওয়ালপিণ্ডি এতে উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেক অধিবেশনে ৪০০/৫০০ লোক এই মহতী জলসায় অংশ গ্রহণ করেন। এই জলসায় বিভিন্ন বিষয়ে যারা বক্তব্য রাখেন তারা হলেন সর্বজনাব মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, এডভোকেট মুজিবুর রহমান, আলহাজ্জ মির্যা আবদুল হক, মাওলানা ফিরোজ আলম, মাওলানা সালেহ্ আহমদ। উপস্থাপনায় ছিলেন জনাব বি, এ, এম, এ সাত্তার ও জনাব জহুর হোসেন।

ফরিদ আহমদ
জেনারেল সেক্রেটারী

সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী—১৯৯২ অপরাহ্নে স্থানীয় একটি হোটেলে আহমদীয়া যুব সংগঠন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের দু'জন বিশিষ্ট আইনজীবী, এডভোকেট মির্যা আবদুল হক ও এডভোকেট মুজিবুর রহমান এবং ঋতুপত্র সম্পাদক আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়ার পর স্বাগত ভাষণ রাখেন সংগঠনের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাদী। জনাব আব্দুল হাদী তাঁর বক্তব্যে এই জামা'তের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরে বলেন যে, এই জামা'ত, ধর্মকে রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখে প্রেম, প্রীতি এবং সেবার মাধ্যমে ইসলাম তথা বিশ্বনবী খাতামান্নবীঈন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রকৃত শিক্ষাকে সমগ্র বিশ্বে প্রচার করে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে ১২৬টি দেশে মসজিদ ও মিশন স্থাপন করে, ৫৪টি ভাষায় পবিত্র কুরআনের পূর্ণাঙ্গ তরজমা ও তফসীর এবং সর্বমোট ১২০ ভাষায় পবিত্র কুরআনের আংশিক অনুবাদ সহ নানা ভাষায় পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তক প্রকাশ করেছে। দেশে দেশে হাসপাতাল এবং স্কুল-কলেজ স্থাপন করে মানবতার সেবা করে যাচ্ছে।

জনাব মুজিবুর রহমান, এডভোকেট তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তানে ভুট্টো সরকার এবং পরবর্তীতে জিয়াউল হক সরকার সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আহমদীদেরকে Not Muslim ঘোষণা করে এবং শান্তিপ্রিয় আহমদীদের উপর নানারূপ নির্যাতন চালায়। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও পাকিস্তানে আহমদীয়াতের অগ্রগতিকে দাবিয়ে রাখা যায়নি। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন পাকিস্তানে মানবাধিকার লংঘনের এইসব ঘটনার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছে। এমনকি খোদ পাকিস্তানেও জাতিগতভাবে তারা এই আইনকে সমর্থন করেনি। লাহোর হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশন সহ বহু সংগঠন সরকারী এই আইনের সমালোচনা করেছেন। জনাব রহমান তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তানে ইতিমধ্যে অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে যার মধ্যে একথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আহমদীদের বিরুদ্ধে গৃহীত এই সমস্ত পদক্ষেপসমূহ সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। এ প্রসঙ্গে তিনি পাকিস্তানের এককালীন প্রধান বিচারপতি জাষ্টিস মুনিরের FROM JINNAH TO ZIA পুস্তকের উল্লেখ করেন। জনাব মুজিবুর রহমান বলেন যে, বিগত একশত বছর যাবৎ তথাকথিত উলামারা আহমদীদের অমুসলিম ফতওয়া দিয়েও যখন আহমদীদের অমুসলিম বানাতে পারেনি তখন রাষ্ট্রীয় সহায়তায় রাজনৈতিকভাবে তাদের অমুসলিম করার বৃথা প্রয়াস চালিয়েছে।

সভাপতির ভাষণে জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী বলেন যে, অন্তরের বিশ্বাসকে কোন আইন দিয়ে বদলানো যায় না। অন্তরের মালিক স্বয়ং অন্তর্যামী। কুরআন, হাদীস বা খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতও কাউকে অমুসলমান ঘোষণা দেয়ার দাবী সমর্থন করে না। তিনি বলেন মুসলমানদের সকল ফিরকা মিলে আজ পৃথিবীতে মুসলমানের যে সংখ্যা তা হলো পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, রসূলের (সাঃ) নির্দেশ অনুযায়ী অমুসলিমের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছানোর পরিবর্তে তারা নিজেরা আজ একে অপরকে কাফের বানানোতে ব্যস্ত।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব। সমাবেশে বহু ভাষায় পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অনুবাদসহ বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কর্মতৎপরতার এক প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়।

আহমদ তবশীর চৌধুরী,
সচিব

সৎপথ ও ভ্রান্তির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে

ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২৯ ঃ আজ ভোর ৬-৪৫ মিঃ সময় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খুলনা নিরালা আবাসিক এলাকা সংলগ্ন মসজিদ ও মিশন হাউজে একদল মোল্লা-মৌলবীর দল হামলা করে। এক পর্যায়ে তারা প্রদর্শনী কক্ষে প্রবেশ করে ব্যাপক ভাংচুর করে, বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদগুলোকে নীচে ফেলে দেয় আর আগুন ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। তারা মিশন হাউসের সম্মুখস্ত গেটের উপরে কলেমা খচিত সাইনবোর্ড ফেলে দেয় এবং ভাংচুর করে। তারা কেন্দ্রীয় জামাতের গাড়ীও ভাংচুর করে। উচ্ছৃঙ্খল মৌলভীদের একাংশ নানা প্রকার খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। তারা বিভিন্ন ভাষায় শ্লোগান দিতে থাকে যেমন, কাদীয়ানীরা কাফের তাদেরকে সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা হউক। তাদের আস্তানা জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও। যদি সরকার তাদেরকে অমুসলমান ঘোষণা না করে তাহলে তারা নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলেও হুশিয়ার করতে থাকে।

(মাওলানা আবদুল আউয়ান খান চৌধুরী মারফত টেলিফোনে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে)

আহমদী বার্তা

একটি আবেদন

আমার শ্রদ্ধেয়, প্রিয় ও স্নেহের সুহৃদ ভাই ও বোনেরা,

সালামবাদ আরয এই যে, ৭ই ফেব্রুয়ারী—১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ইং আমাদের সালানা জলসার সময় আমার (১) মিলিটারী পেনশন বই Ts/948/Com (২) কৃষি ব্যাংক চান্দ্রাবাজার শাখা, পাশ বই হিসাব নং 698, (৩) চাঁদপুর পোষ্ট অফিস সেভিং পাশ বই এবং আরো প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র হারিয়ে গিয়েছে। এগুলি আমার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এগুলি পাবার জন্য আপনারা খাস ভাবে দোয়া করবেন ও অনুসন্ধান করবেন। আপনারা কেউ পেয়ে থাকলে আমাদের মাননীয় ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অফিসে জমা দিয়ে আমাকে উপকৃত এবং বাধিত করিবেন।

খাকসার—মোঃ হাফিজুদ্দিন মোস্তান

সন্তান লাভ

গত ২০-২-৯২ ইং রোজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২-৩৫ মিনিটে আমার ভাই এম. এ হান্নানকে আল্লাহ্‌তা'লা এক পুত্র সন্তান দান করিয়াছেন (আলহামদুলিল্লাহ)। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট সকাতর দোয়ার আবেদন জানান যাইতেছে, আল্লাহ্‌তা'লা যেন নবজাতককে দীর্ঘজীবী ও খাদেমে দীন করেন, আমীন। হাফেয সেকান্দর আলী, মোয়াল্লেম

শোক সংবাদ

বিগত ৮-২-৯২ ইং রোজ শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৬৮তম সালানা জলসার দ্বিতীয় দিনের বিকালের অধিবেশন চলাকালে জলসাগাহে রিকাবীবাজার জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব এম, এম, আব্দুর রউফ সাহেব হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রাত ৯-২৫ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহে ... ...ওয়া রাজেউন) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বৎসর। মরহুম মৃত্যুকালে স্ত্রী, দুই ছেলে, দুই মেয়ে বৃদ্ধা মা, দুই নাতী সহ অগণিত শুভানুধ্যায়ী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে যান।

তিনি মিষ্টভাষী সদালাপী, সমাজ সেবক ও কয়েকটি হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন জনদরদী, লোক সেবা ও কোমল ব্যবহারের জন্য তিনি বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করেন।

জলসার শেষদিন সকালে ৭-০০ ঘটিকায় জলসাগাহে তাঁর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। পরে মরহুমের লাশ ট্রাক যোগে রিকাবী বাজারে নেয়া হয়। অগণিত লোকের সমাবেশে সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে তাঁর দাফন কাজ সুসম্পন্ন হয়।

মরহুমের পরিবারের সকল সদস্যই সাবরে জামিল লাভে সমর্থ্য হয় ও তাঁর আত্মার মাগফেরাত লাভ ও জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ মোকামে যেন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে স্থান দেন সেজন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

মইন উদ্দিন আহমদ,
নারায়ণগঞ্জ, আঃ মুঃ জামাত

বিষ্ণুপুর আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের নিষ্ঠাবান মোখলেস আহমদী মরহুম আবদুল আলীম ভূইয়ার (গালিম ভূইয়া) স্ত্রী আইনক চান বিবি গত ৫/২/৯২ ইং রোজ বুধবার প্রত্যুষে তাঁর নিজ গৃহে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহে.. ..... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বৎসর। তিনি মৃত্যুকালে দুই মেয়ে, এক ছেলে এবং বহু সংখ্যক নাতী-নাতিনী রেখে গিয়েছেন। সকল আহমদীর নিকট তাঁর রূহের মাগফিরাতের জন্য দোয়ার অনুরোধ করছি।

আমীর মাহমুদ ভূইয়া,
বিষ্ণুপুর,

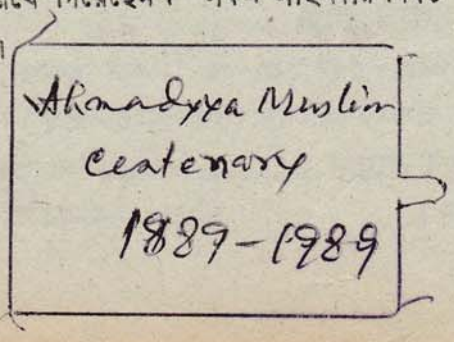

মালী (আর্থিক) কুরবানী

- মুত্তাকী ও মুমেন হওয়ার পথে একটি বিশেষ পদক্ষেপ,
- ঈমান রূপ বৃক্ষকে সদা সজীব রাখে,
- একটি মাপ কাঠি যদ্বারা ব্যক্তি ও সমাজের ঈমানের স্তরকে সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায়,
- রীতিমত করলে ইহা ধন-সম্পদকে বহুগুণে সমৃদ্ধশালী করে এবং পবিত্র করে,
- দ্বারা বায়তুল মালকে শক্তিশালী না করলে ইসলাম প্রচারের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না,
- দ্বারাই এ যুগে ইসলামের সেবা করার অন্যতম উৎকৃষ্ট পন্থা। এ যুগে প্রাণ চাওয়া হয় না, যথাসাধ্য কুরবানী করার মাধ্যমে প্রতিশ্রুত জান্নাতের অধিকারী হওয়া যায়।

তাই ১৯৯১-৯২ আর্থিক বছরে আপনার পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য :

- হিসাব দেখে এমনভাবে চাঁদা আদায় করুন যেন ৩০-৬-৯২ এর মধ্যে আপনার বাজেটকৃত চাঁদা সম্পূর্ণ আদায় হয়ে যায়।
- মাহে রমযান মালী কুরবানী করার প্রকৃষ্ট সময়। আঁ-হযরত (সাঃ) এ মাসে ঝড়ের গতিতে মালী কুরবানী করতেন।
- এ মাসে তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায় করে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর বিশেষ দোয়ার অংশীদার হোন।
- আপনি কি বকেয়াদার? যদি হন তাহলে কিস্তিতে বকেয়া আদায় করার মনোভাব গ্রহণ করুন। যদি দিতে অপারক হন তাহলে এ বছরের পূর্ণ চাঁদা আদায় করতঃ স্থানীয় জামাত ও ন্যাশনাল আমীর সাহেবের মাধ্যমে হুযুর (আইঃ)-এর নিকট মাফির দরখাস্ত করতে পারেন।
- যদি নির্ধারিত হারে চাঁদা দিতে অপারগ হন তবে কারণ দর্শিয়ে উপরোক্ত নিয়মে হুযুর (আইঃ)-এর নিকট আবেদন করে কম হারে চাঁদা দেয়ার সুযোগ গ্রহণ করুন।
- মনে রাখবেন আল্লাহ্‌তা'লা আপনার অবস্থা সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত রয়েছেন।
- নিজে আমল করুন ও অন্যকে আমল করতে উদ্বুদ্ধ করুন।

সাহেবুল কাহ্‌ফ

29th Febuary, 1992

আহ্‌মদী

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে
আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড,
ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদকঃ মকবুল আহমদ খান

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla
at Ahmadiyya Art Press for the proprietors,
Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan